~ www.amarboi.com ~

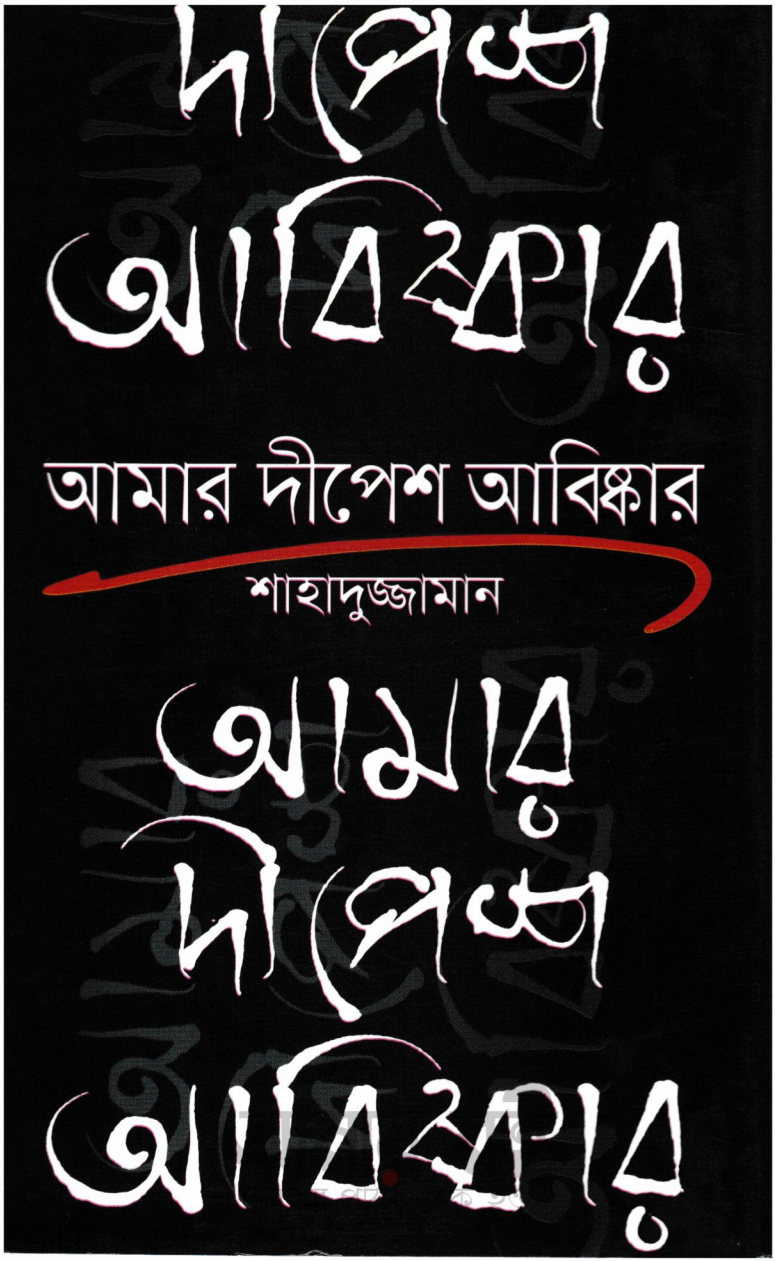

~ www.amarboi.com ~

আমার দীপেশ আবিষ্কার

দীপেশ চক্রবর্তী বর্তমান বিশ্বের অন্যতম একজন সমাজ ভাবুক এবং ইতিহাসবিদ।
তার 'প্রভিন্সিয়ালাইজিং ইউরোপ' উত্তরঔপনিবেশিক চিন্তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রভাবশালী বই। কথাসাহিত্যিক এবং চিকিৎসা নৃবিজ্ঞানী শাহাদুজ্জামান তার সাহিত্য এবং গবেষণার ক্ষেত্রে কিভাবে দীপেশ চক্রবর্তীর চিন্তা দিয়ে প্রভাবিত হয়েছেন সে কথা পাঠকদের জানিয়েছেন এ বইয়ে। শাহাদুজ্জামানের নেয়া দীপেশ চক্রবর্তীর একটি মূল্যবান সাক্ষাৎকারও যুক্ত হয়েছে এ বইয়ে, সেই সঙ্গে রয়েছে দীপেশ চক্রবর্তীর সাথে তার ই-মেইল বিনিময়ের সংকলন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ISBN : 978 984 410 166 1

~ www.amarboi.com ~

আলোকচিত্র : কেট্রিওনা ফরেস্ট (Catriona Forrest)

শাহাদুজ্জামান বাংলা মননশীল কথাসাহিত্যের বিশিষ্ট নাম। গল্প, উপন্যাস ছাড়াও প্রবন্ধ, অনুবাদ, ভ্রমণ এবং গবেষণার ক্ষেত্রে রয়েছে তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। প্রকাশনা সংস্থা মাওলা ব্রাদার্স আয়োজিত কথাসাহিত্যের পাণ্ডুলিপি প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়ে প্রকাশিত হয় শাহাদুজ্জামানের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'কয়েকটি বিহ্বল গল্প' (১৯৯৬)। তার উল্লেখযোগ্য বইয়ের ভেতর রয়েছে *ক্রাচের কর্নেল*, *একজন কমলালেবু*, *অন্য এক গল্পকারের গল্প নিয়ে গল্প*, *মামলার সাক্ষী ময়না পাখি*, *কথা পরম্পরা*, *একটি হাসপাতাল*, *একজন নৃবজ্ঞানী*, *কয়েকটি ভাঙ্গা হাড়* ইত্যাদি। কথাসাহিত্যে সামগ্রিক অবদানের জন্য ২০১৬ সালের বাংলা একাডেমি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তিনি। তার গল্পগ্রন্থ *মামলার সাক্ষী ময়না পাখি* ২০১৯ সালে *প্রথম আলো* বর্ষ সেরা বই হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে।

শাহাদুজ্জামানের পড়াশোনা মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে। নেদারল্যান্ডসের আমস্টার্ডাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি অর্জন করেন চিকিৎসা নৃবিজ্ঞানে। বর্তমানে তিনি যুক্তরাজ্যের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন। শাহাদুজ্জামানের জন্ম ১৯৬০ সালে ঢাকায়।

e-mail: zshahaduz@gmail.com

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
আমার দীপেশ আবিষ্কার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমার দীপেশ আবিষ্কার

শাহাদুজ্জামান

মাওলা ব্রাদার্স

~ www.amarboi.com ~

প্রকাশনার সাত দশকে
মাওলা ব্রাদার্স

© লেখক

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০২০

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ০২-৪৭১১১৭৪৯ ০১৯৩৮২৬১৬৪৯
ই-মেইল : mowlabrothers@gmail.com

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
বাংলাবাজার কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ৩য় তলা
ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
এম বি প্রিন্টার্স
২৮ টিপু সুলতান রোড ওয়ারী ঢাকা ১১০০

দাম
দুইশত টাকা মাত্র

ISBN 978 984 410 166 1

AAMAR DIPESH ABISHKAR (a collection of short essays and interviews) by Shahaduzzaman. Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers 39/1 Banglabazar, Dhaka 1100. Cover Designed by Dhruba Esh. Price : Taka Two Hundred only.

আমার বই

~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

দীপেশ চক্রবর্তী (জন্ম : ১৯৪৮) সাম্প্রতিক বিশ্বের অন্যতম একজন ইতিহাসবিদ এবং সমাজচিন্তক। গত শতাব্দীর আশির দশকে 'সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ' নামে যে দল নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে উত্তরউপনিবেশবাদী ইতিহাস চর্চায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিলো দীপেশ চক্রবর্তী ছিলেন তার অন্যতম একজন সদস্য। অভিজাতের ইতিহাস নয় বরং নিম্নবর্গের ইতিহাসের সন্ধানে তিনি, রনজিত গুহ, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, গৌতম ভদ্র প্রমুখ সাবঅলটার্ন দলের বিভিন্ন সদস্যরা প্রণিধানযোগ্য অগণিত কাজ করেছেন। দীপেশ চক্রবর্তী তার পরবর্তী কাজে বিশেষ করে মনোযোগ দিয়েছেন 'আধুনিকতার' ধারণাটি নিংড়ে বুঝতে। তার 'প্রভিন্সিয়ালাইজিং ইউরোপ' বইটি ইতিহাস ভাবনার ক্ষেত্রে বর্তমান সময়ে অন্যতম প্রধান একটি বই হিসেব বিবেচিত। যা দীপেশ চক্রবর্তী বর্তমানে আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন। সমাজবিজ্ঞানে অবদানের জন্য তিনি ২০১৪ সালে মর্যাদাবান 'টয়েনবী পুরস্কার' অর্জন করেন। তার অন্যান্য বইগুলোর ভেতর রয়েছে—'রিথিংকিং ওয়ার্কিং ক্লাস হিস্ট্রি', 'হ্যাবিটেশন অফ মডার্নিটি : এসেজ ইন ওয়েক অফ সাবঅলটার্ন স্টাডিজ', 'দি কলিং অফ হিস্ট্রি : স্যার যদুনাথ সরকার এ্যান্ড হিজ এমপায়ার অব ট্রুথ', 'দি ক্রাইসিস অফ সিভিলাইজেশন : এক্সপ্লোরিং অন গ্লোবাল এ্যান্ড প্ল্যানেটরি হিস্টরিজ'। বাংলায় তার প্রকাশিত বই 'মনোরথের ঠিকানা'। দীপেশ চক্রবর্তীর জন্ম আর বেড়ে ওঠা কলকাতায়। নানা বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন তিনি। কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে পদার্থবিজ্ঞানে পাশ করার পর কলকাতার ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট থেকে এমবিএ করেছেন। এরপর তিনি অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে ইতিহাসে পিএইচডি করেন।

বিশ্বস্বাস্থ্য গবেষণার অংশ হিসেবে একসময় ভারত অঞ্চলের মহামারী বিষয়ে দীপেশ চক্রবর্তীর একটি লেখা পড়ার মাধ্যমে তার চিন্তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। এরপর তার 'প্রভিন্সিয়ালাইজিং ইউরোপ' বইটিসহ অন্যান্য লেখপত্র পড়ি। আমি ইতিহাসবিদ বা সমাজবিজ্ঞানী নই। নেহাত ইতিহাস এবং সমাজবিজ্ঞানে আগ্রহী একজন মানুষ। কথাসাহিত্য আমার প্রধান কাজের ক্ষেত্র, বিশ্বসাহিত্য গবেষণা আমার পেশা। দীপেশ চক্রবর্তীর ইতিহাস ভাবনা আমাকে

~ www.amarboi.com ~
নানা মাত্রায় উদ্বুদ্ধ করে। তার চিন্তাসূত্র সাহিত্য এবং বিশ্বস্বাস্থ্য গবেষণা উভয় ক্ষেত্রেই বিভিন্ন ভাবনার জট খুলতে আমাকে সাহায্য করে।

কাকতালীয়ভবে তার এক বন্ধুর মারফত দীপেশ চক্রবর্তী আমার 'চিরকুট' বইটি হাতে পান এবং বইটি পড়ে তার ভালো লাগার কথা জানিয়ে আমাকে একটি ই-মেইল করেন। এই অপ্রত্যাশিত চিঠি স্বভাবতই আমাকে বিস্মিত করে। সেই সূত্রে তার সঙ্গে ই-মেইলে যোগাযোগ ঘটে, চিন্তা আদান-প্রদান হয় এবং এক সময় দেখা-সাক্ষাৎ হয়। বিশ্ব পরিসরে বিখ্যাত চিন্তাবিদ হওয়া সত্ত্বেও অমায়িক, সজ্জন দীপেশ চক্রবর্তীর সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। তিনি হয়ে ওঠেন আমার দীপেশ দা। এই বইয়ে আমার সেই দীপেশ আবিষ্কারের অভিযাত্রার কথাটিই সংকলিত করেছি। এতে আছে দীপেশ চক্রবর্তীর 'প্রভিন্সিয়ালাইজিং ইউরোপ' বইটি নিয়ে আমার আলোচনা, আমাদের স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দীপেশ চক্রবর্তীর ভাবনার প্রসঙ্গিকতা নিয়ে আমার দেয়া একটি বক্তৃতা, আমার নেয়া দীপেশ দার একটি সাক্ষাৎকার এবং সেই সঙ্গে তাঁর সঙ্গে আমার ই-মেইলে নানা ভাবনা বিনিময়ের নির্বাচিত অংশ।

দীপেশ চক্রবর্তীর ভাবনা সংক্রান্ত বাংলা লেখা বিশেষ সুলভ নয়। আমার এ বইটি দীপেশ চক্রবর্তীর ভাবনা বিষয়ক তাত্ত্বিক কোন রচনা নয়। এটি নেহাত দীপেশের ভাবনা জগতের সামান্য কিছু অংশে আমার ব্যক্তিগত আনাড়ি পরিভ্রমণ মাত্র।

ফেব্রুয়ারি ২০২০ **শাহাদুজ্জামান**

আমার বই

~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

আমার দীপেশ আবিষ্কার ৯
চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যে উপনিবেশবাদের নির্মাণ : দীপেশ চক্রবর্তীর চিন্তার আলোকে ২২
জিজ্ঞাসা পর্ব ৪৪
দীপেশ চক্রবর্তীর সাথে আলাপ: 'প্রভিন্সিয়ালাইজিং ইউরোপ'
আমার আত্মার প্রতিবাদ' ৫৩
দীপেশ চক্রবর্তীর সাথে ই-মেইল বিনিময় ৭৭

আমার বই

~ www.amarboi.com ~

আমার দীপেশ আবিষ্কার

কাণ্ড তিনপ্রকার। কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড আর রসকাণ্ড। লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সব কাণ্ডে যুক্ত থাকলেও রস কাণ্ডই আমার স্বাচ্ছন্দ্যের জায়গা বলে মনে করি। আমার প্রাণের আরাম সাহিত্য রচনায়। তবে সেই রসকাণ্ডে সক্রিয় থাকতে জ্ঞানকাণ্ডেও যাতায়াত করতে হয় বৈকি। তাছাড়া আমার জীবিকা বিশ্বস্বাস্থ্য বিষয়ে গবেষণা, ফলে জ্ঞানকাণ্ডের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় নেই। বিশ্বস্বাস্থ্যের ইতিহাস বিষয়ক একটি গবেষণার সূত্র ধরেই দীপেশ চক্রবর্তীর লেখার সঙ্গে প্রথম পরিচয়। ভারতবর্ষের জনস্বাস্থ্যের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে গিয়ে খোঁজ পাই তার 'শরীর, সমাজ ও রাষ্ট্র : ঔপনিবেশিক ভারতে মহামারী ও জনসংস্কৃতি' লেখাটির। লেখাটি গৌতম ভদ্র এবং পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' বইটিতে অন্তর্ভুক্ত[১]। পরে লেখাটি দীপেশ চক্রবর্তী 'ইতিহাসের জনজীবন ও অন্যান্য প্রবন্ধ' নামে তার প্রথম বাংলা বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করেছেন [২]। এই বইয়ের কৌতূহলোদ্দীপক লেখাগুলো তো বটেই বিশেষ করে পছন্দ হয় বইটির ভূমিকা। জানতে পারি তিনি পড়েছেন পদার্থ বিজ্ঞান, সেখান থেকে গেছেন ব্যবসা-প্রশাসন পড়তে অবশেষে হয়েছেন ইতিহাসবিদ। নিজের এই মিশ্র একাডেমিক ডিসিপ্লিন নিয়ে দীপেশ মজা করেছেন ভূমিকাতে, জানিয়েছেন কি করে তিনি সব জ্ঞানকাণ্ডেরই খানিকটা বাইরের লোক এবং তাতে বরং তার একধরনের সুবিধাই হয়েছে। দীপেশের এই নানা ঘাটের জল খাওয়ার অভিজ্ঞতার কথা পড়তে পড়তে বিশেষভাবে কৌতূহলী হয়ে উঠি তার ব্যাপারে। অনেক নগণ্য পরিসরে হলেও নিজের জীবনের আঁকা-বাঁকা পথ চলার সাথে গোপনে একটা মিল দেখতে পেয়ে একধরনের আনন্দ হয়। আমিও নানা ঘাট ঘুরে আসা মানুষ। পড়েছি চিকিৎসাবিজ্ঞান, সেখান থেকে বেরিয়ে পিএচডি করেছি নৃবিজ্ঞানে, আবার নিরন্তর সক্রিয় আছি সাহিত্য চর্চায়। দীপেশ বিষয়ে আরো কৌতূহল নিবৃত্ত করতে গিয়ে খোঁজ পাই তার 'Provincializing Europe' বইটির [৩]। কিছুদূর পড়বার পরই লক্ষ করি নানা জটিল জ্ঞানতাত্ত্বিক বিতর্কের বই হলেও তিনি সেই কথিত 'বাইরের মানুষ' বলেই হয়তো এমন ভাষায় লিখেছেন যে, আমার মতো আরেক বাইরের মানুষকে এ বই গেঁথে ফেলে বঁড়শির মতো। সাবঅলটার্ন তাত্ত্বিকদের ভাবনার

~ www.amarboi.com ~

সাথে অল্পবিস্তর পরিচয় ছিলো কিন্তু দীপেশের বইটি পড়তে গিয়ে মনে হলো এ শুধু 'History from below'-এর ব্যাপার নয়, তিনি নতুন কিছু কথা বলছেন। ইতিহাসের ছাত্র নই, কিন্তু এই বইয়ের কথাগুলো একেবারে ভেতরে গিয়ে নাড়া দিতে থাকে। আমি একরকম ঘোরের ভেতর টানা বইটা পড়ে ফেলি। এই বইটি পড়বার সময়েই দীপেশ চক্রবর্তীর সাথে এক অদ্ভুত কাকতালীয় ঘটনায় ব্যক্তিগত যোগাযোগ ঘটে। তিনি আমার একটি বই পড়ে আমাকে ই-মেইল করেন। সে অন্য কাহিনি। মহামতি শেক্সপীয়রের চরিত্র হোরাসিওর কথা মনে পড়ে, 'এই স্বর্গমর্ত্যে বহু ব্যাপার আছে যা তোমার জানার বাইরে।' সেই থেকে শুরু হয় দীপেশ চক্রবর্তীর সাথে আমার ই-মেইল চালাচালি। চিনতে পারি বিশ্বে জীবিত চিন্তকদের ভেতর অন্যতম এই মানুষটি নেহাতই সজ্জন এক বাঙালি ভদ্রলোক। জানতে পারি তিনি শুধু জ্ঞানকাণ্ডের মানুষ নন, রসকাণ্ডেও আছে তার নিয়মিত যাতায়াত। সাহিত্য রচনা করেন তিনি, গান করেন এমনকি একসময় ছিলেন চলচ্চিত্রের নেপথ্য গায়কও। শুধু লেখা নয়, চেনা পরিচয়, দেখা সাক্ষাৎ হয় ব্যক্তি দীপেশ চক্রবর্তীর সঙ্গে। তিনি হয়ে উঠেন আমার দীপেশ দা।

ফেরা যাক 'Provincializing Europe' প্রসঙ্গে। বইটির সার্বিক মর্মার্থ আত্মস্থ করেছি এমন দাবি করি না। তবু যেটুকু বুঝেছি তাতে আমার মনের ভেতরের নানা চোরাগোপ্তা বদ্ধ দরজা খুলে গেছে, আলো ঢুকেছে সেখানে। বইটি আমাকে তাড়িত করার একটা আত্মজৈবনিক মাত্রা আছে। আমার তারুণ্য কেটেছে বাংলাদেশের মতো বিশেষ উত্তর-ঔপনিবেশিক ইতিহাস জারিত এক জনপদে—বাম ঘরনার চিন্তা তাড়িত শিল্প, সাহিত্য রাজনীতি চর্চায়। পারিবারিক এবং সামাজিক পরিমণ্ডল মধ্যবিত্তের হলেও কাজের সূত্রে সুযোগ ঘটেছে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত জনপদের নিম্নবর্গের জীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবার। পেশাসূত্রে বিশ্বস্বাস্থ্য গবেষণার পথ ধরে এরপর সুযোগ হয়েছে ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকার অনেক দেশের জীবনযাপনের মুখোমুখি হবার। জীবন-জীবিকার পাকচক্রে শেষে বসবাস শুরু করেছি ব্রিটেনে। যোগ দিয়েছি ব্রিটেনের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা এবং গবেষণার কাজে। পৃথিবী গ্রহের নানা চরাচরে ঘুরে সমাজ, সভ্যতা, আধুনিকতা নিয়ে নানা প্রশ্ন তাড়িত হয়েছি। আধুনিকতা নিয়ে ইউরোপের যে বড়াই তা নিয়ে একটা খটকা মনে রয়ে গেছে বরাবর। জ্ঞানজগতে ইউরোপীয় আধিপত্য, ইউরোপীয় মূল্যবোধের সার্বজননীতার দাবি নিয়েও মনের ভেতর বয়ে বেড়িয়েছি অস্বস্তি। চিন্তায়, রাজনীতিতে ইউরোপীয় আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করে উত্তর ঔপনিবেশিক চিন্তকদের ধারাবাহিক চর্চার খোঁজখবর কিছু জানি। কিন্তু Provincializing Europe পড়তে গিয়ে মনে হচ্ছিল যেন আমার একেবারে ঘনিষ্ঠ জীবন, চেনা ভূগোল ছুঁয়ে ছুঁয়েই ছায়ার মতো বয়ে বেড়ানো দীর্ঘদিনের সেইসব খটকা, অস্বস্তির মোকাবেলা করছি। দীপেশ যে জটিল, সূক্ষ্ম, অন্তর্ভেদী যুক্তিজালে

~ www.amarboi.com ~

ইউরোপীয় ভাবনা সৌধের ইট, পাথর, সুড়কি ধসিয়ে দিয়েছেন তার তীব্রতায় মুগ্ধ হয়েছি। বইটি পড়তে গিয়ে বুকের উপর অনেকদিনের চেপে থাকা একটা পাথর যেন সরে গেছে একটু একটু করে।

দেখতে পাই দীপেশ বলছেন—'ইউরোপ' নেহাত একটা ভূখণ্ড মাত্র নয়, এটি একটি মানসিক প্রবণতা। ইউরোপ পৃথিবীর অনেক ভূখণ্ডের ভেতর একটি ভূখণ্ড হওয়া সত্ত্বেও যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় সেই ভূখণ্ডের মানসিক প্রবণতাকেই প্রধান এবং একমাত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার পায়তারায় চলছে বহুকাল তার তত্ত্ব তালাশ করেছেন তিনি। তিনি বলছেন, 'ইতিহাস'ও কোন ধারাবাহিক, ক্রমবিকাশমান একটি পথ নয় যে, এ যাত্রায় সকল জাতি, সমাজ একই প্রক্রিয়ায় নিজেদের বিকশিত করে একই গন্তব্যে পৌঁছাবে। সেই সাথে তিনি এ-ও বলছেন যে, 'সময়ও' ঠিক সরল রেখায় এগিয়ে চলা একক স্বয়ম্ভূ কোন প্রপঞ্চ নয় বরং একই সময়ের ভেতর জট পাকিয়ে থাকে অনেক রকম সময়। সময় বস্তুত 'সময়গ্রন্থি'।

জ্ঞানজগতে বিশ্বব্যাপী অজ্ঞতার যে অসম খেলা চলছে অবিরাম তার দিকে চোখ ফেরান দীপেশ। তৃতীয় দুনিয়ার চিন্তা-চর্চা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকেও নির্বিঘ্নে জ্ঞান-চর্চা করতে পারেন ইউরোপীয় চিন্তকেরা অথচ বিপরীত চর্চা করা অসম্ভব। ব্যাপারটা বেশ কৌতুহলোদ্দীপক যে হাজার, দু'হাজার বছর পুরনো হলেও ইউরোপ থেকে উদ্ভূত সব চিন্তাসমূহই বরাবর জীবিত অথচ যত মেধাবীই হোক না কেন ভারতের তের শতকের নৈয়ায়িক গাঙ্গেসা, ষষ্ঠ শতাব্দীর ভাষাতাত্ত্বিক দার্শনিক ভর্তৃহারি বা একাদশ শতকের নন্দনতাত্ত্বিক অভিনব গুপ্তের চিন্তা-ভাবনা সবই মৃত। পৃথিবীর জ্ঞান-চর্চায় স্থান নেই সংস্কৃত, ফার্সি বা আরবি ভাষার ধারাবাহিক জ্ঞান-চর্চার। কাল পরিক্রমায় ইউরোপীয়, অ-ইউরোপীয় সব দেশের ভাবুকই পরিণত হয়েছে 'ইউরোপীয়'। দীপেশ মানছেন যে সত্যিকার, ঐতিহাসিক বা কাল্পনিক নানা ইউরোপ আছে কিন্তু তিনি ভৌগোলিক ইউরোপের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী নন, বরং আগ্রহী 'ইউরোপ' নামের বিশেষ সেই মনস্তত্ত্বে। উপনিবেশের মনস্তত্ত্বে ইউরোপ হয়ে উঠেছে আধুনিকতার পীঠস্থান। এই বইয়ের মাধ্যমে তিনি ইউরোপীয় চিন্তার সার্বজননীনতার সেই দাবিকে ধূলিসাৎ করেছেন ইউরোপীয় চিন্তার কাছে ঋণ স্বীকার করেই। তার প্রথম ঋণ মার্ক্সের প্রতি, যিনি ইউরোপীয় চিন্তার বিশ্লেষণাত্মক ধারার প্রধান পুরোধা, যা প্রচলিত আদর্শকে সমালোচনায় ফেলে ভাঙচুর করে একটা নতুন ন্যায়-ভিত্তিক সমাজের কথা ভাবে এবং দ্বিতীয় ঋণ ইউরোপীয় চিন্তার হারম্যানিউটিক ধারার পুরোধা হাইডেগারের প্রতি, যে ধারা মানুষের অভিজ্ঞতার বিভিন্নতার খুঁটিনাটি খুঁজে দেখতে চায়। তবে দীপেশ বলেন এই দুই পুরোধাসহ ইউরোপীয় প্রধান চিন্তকদের চিন্তাসমূহ দুনিয়াকে বুঝবার জন্য 'অপরিহার্য (Indispensable) বটে, কিন্তু 'অপর্যাপ্ত' (Inadequate)।

~ www.amarboi.com ~

ইউরোপীয় চিন্তার অপর্যাপ্ততার একেবারে গোড়া ধরে টান দেন দীপেশ 'ইতিহাসের বিশ্রামাগার' (Waiting room of History) নামের এক অভিনব ধারণা দিয়ে। একটা সাধারণ উপমার ভেতর যেন নিমেষে খোলাসা হয়ে যায় অনেক ধোঁয়াসা। তিনি বলেন, প্রচলিত ধারণা এই যে, মানবিক অধিকার, নাগরিকত্ব, রাষ্ট্র, গণতন্ত্র, সামাজিক ন্যায়, বৈজ্ঞানিক যুক্তি আধুনিকতার এই মূল স্তম্ভগুলোর উৎপত্তি এবং বিকাশ ঘটেছে ইউরোপে। সেই সঙ্গে প্রচলিত ধারণা এ-ও যে বাকি পৃথিবীর কর্তব্য হচ্ছে আধুনিকতার এই স্তম্ভগুলো নিজেদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু অবস্থা-দৃষ্টে দেখা যাচ্ছে—ইউরোপ ছাড়া বাকী পৃথিবীতে এখনও এইসব ধারণার চর্চা অনুপস্থিত। ফলে তারা আধুনিক হবার যাত্রায় পিছিয়ে। যে কারণে সেই সব সমাজের দায়িত্ব নানারকম প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে চেষ্টা চরিত্র করে একসময়ে গিয়ে ইউরোপকে ছোঁয়া, ইউরোপের মতো আধুনিকতায় বিকশিত হয়ে ওঠা। ব্যাপার এই যে ইউরোপের 'হয়ে গেছে', বাকি পৃথিবীর 'এখনও হয়নি'। তবে স্ববিরোধী ব্যাপার এই যে, ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসকরা এই আধুনিক সভ্যতার ধারণাগুলো একদিকে তাদের উপনিবেশে প্রচার করেছে যেমন, অন্যদিকে ঔপনিবেশিক অঞ্চলে এইসব আধুনিক ধারণার চর্চার অধিকারকেও প্রত্যাখ্যান করেছে দৃঢ়ভাবে। ব্রিটিশ তাত্ত্বিক জন স্টুয়ার্ড মিল মনে করতেন—স্বশাসন হচ্ছে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ রূপ কিন্তু তিনি এশিয়া এবং আফ্রিকার মানুষদের সেই স্বশাসনের অধিকার দেয়ার বিপক্ষে ছিলেন। তিনি মনে করতেন এইসব অবিকশিত জাতি স্বশাসনের জন্য এখনও তৈরি নয়। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক স্বশাসন চর্চা করতে হলে আগে তাদের নানারকম প্রস্তুতি নিতে হবে। তাদের শিক্ষিত হয়ে উঠতে হবে, হতে হবে যথাযথ রাজনৈতিক বোধসম্পন্ন মানুষ। যতদিন সেসব অর্জন না হচ্ছে ততদিন তাদের অপেক্ষা করতে হবে ইতিহাসের একটি কল্পিত 'বিশ্রামাগারে'। প্ল্যাটফর্মে তুমি এসেছো ঠিকই কিন্তু যে ট্রেন আধুনিকতার স্টেশনে যাবে তাতে চড়বার মতো যথেষ্ট ভাড়া তোমার যোগাড় হয়নি। সুতরাং 'ওয়েটিং রুমে' অপেক্ষা করো, ভাড়া যোগাড় করো।

কিন্তু ভারতীয় স্বাধিকারের আন্দোলন তো ছিলো সেই অপেক্ষার বিরুদ্ধেই। কোন অপেক্ষা নয়—স্বাধীনতা, গণতন্ত্র চাই এখনই, এই ছিলো দাবি। তৃতীয় বিশ্বের পুরো উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনের মোদ্দা কথাই তো এই যে, শাসকরা বলছে 'এখন না' এবং শোষিতরা বলছে 'এখনই' এই নিয়ে দ্বন্দ্ব। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে কৃষকরা যুক্ত হলেও ইউরোপীয় চিন্তকদের কাছে সেই আন্দোলন আধুনিক অর্থে 'রাজনৈতিক' ছিলো না, কারণ, কৃষকরা আন্দোলন করেন ঈশ্বর, পারলৌকিক বিশ্বাস ইত্যাদি নিয়ে। তাদের মতে এগুলো কোন আধুনিক যুক্তিবাদী মানুষের রাজনৈতিক আন্দোলন নয় বরং তা প্রাক-রাজনৈতিক।

~ www.amarboi.com ~

রাজনৈতিক চেতনার একধরনের অবিকশিত ভ্রূণ। কিন্তু ভারতের সাবঅলটার্ন তাত্ত্বিকদের গুরু রনজিৎ গুহ গভীর তর্ক করে দেখিয়েছেন কি করে কৃষকরা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াইয়ে তাদের সঙ্গী করে নেয় ঈশ্বর, আত্মা বা মৃত পূর্বপুরুষকে এবং তাদের সংগ্রাম বস্তুত পুরোপুরি রাজনৈতিক। গুহ 'রাজনৈতিক' কথাটি নিয়েই বিতর্ক তোলেন। এই পথ ধরে এগিয়েই দীপেশ এই তর্ক তোলেন যে, আধুনিকতার একক সার্বজনীন কোন রূপ নেই, 'ইতিহাসের বিশ্রামাগারে' বসে না থেকেই একটি জনগোষ্ঠী নিজেদের মতো করে আধুনিক হয়ে উঠতে পারে।

সমসাময়িককালেও আমাদের দেশের রাজনীতি, শিল্পসাহিত্যে যে কলরব তা তো বস্তুত 'ওয়েটিং রুমে' বসে থাকা মানুষের কলরব বলেই মনে হয়। তাদের সবারই এই আক্ষেপ যে কবে ঠিক ইউরোপের মতো গণতন্ত্র, শিক্ষা, রাষ্ট্র, শিল্প সাহিত্য রচনা করতে পারবো আমরা? কবে আমরা আধুনিকতার সেই ইউরোপ কথিত ট্রেনে চেপে পৌঁছে যাব মঞ্জিলে। কিন্তু 'Provincializing Europe' ইশারা দেয় যে, ইউরোপই আধুনিকতার একমাত্র মঞ্জিল নয়। অন্য কোন ট্রেনে চেপে পৌঁছানো যেতে পারে অন্য কোন স্টেশনে যেটিও 'আধুনিক' কিন্তু সে আধুনিকতার চেহারাটি হয়তো ঠিক ইউরোপের মতো নয়, অন্যরকম। তৈরি করা যেতে পারে বিকল্প কোন আধুনিকতা। দীপেশ অবশ্য সতর্ক করে দেন এ নেহাত ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির প্রতি সন্তান জানানোর Cultural Relativity-র ব্যাপার নয়। এটি বরং আধুনিকতার বহুত্বের ধারণার দিকে যাত্রা। আধুনিকতার এই বহু এবং বিকল্প ধারণা আমাকে তাড়িত করে।

কিন্তু কল্পনায় অন্য আধুনিকতার ধারণাটি আনা দুরূহ কারণ ইউরোপ 'আধুনিকতার' একটি নির্দিষ্ট রূপই গেঁথে দিয়েছে আমাদের মনে। জানিয়েছে আধুনিকতার সবচেয়ে বিকশিত রূপ দেখতে হলে আমাদের তাকাতে হবে ইউরোপের দিকেই। সেভাবে তাকাতে গিয়ে স্বভাবতই বাকি সব অ-ইউরোপীয় সমাজ নিজেদের দেখতে পায় 'অবিকশিত', 'অসম্পূর্ণ', 'সীমাবদ্ধ' হিসেবে। একটা হীনমন্যতার পাঁচিল ঘিরে থাকে তাদের। দীপেশ দেখান ইতিহাসের এই বিবর্তনবাদী ধারণা কেমন গেঁথে আছে মার্ক্সের ভাবনাতেও। মার্ক্স যখন লেখেন, 'Country that is more developed industrially only shows, to the less developed, the image of the future' (Chakrabarty: 2007, p 7). তখন তার চিন্তাসূত্রে ইতিহাসের একমুখীনতার ধারণার চিহ্নই দেখতে পাওয়া যায়। এই যে ধাপে ধাপে ইতিহাসের এগিয়ে যাওয়ার ধারণা যাকে দীপেশ বলছেন 'Historisism', তা ইউরোপীয় চিন্তা-চর্চার ঐতিহ্যেরই অংশ। এই সূত্র ধরেই দীপেশ মোক্ষম প্রস্তাব করেন যে, চিন্তার সাথে আসলে সম্পর্ক আছে স্থানের। বলেন একটা স্থানের ইতিহাস, অভিজ্ঞতা সেই স্থানে জন্ম নেয়া চিন্তার ভেতর তার ছাপ রেখে যায়। প্রস্তাব করেন মার্ক্সের চিন্তার পেছনে ইউরোপে বিশেষ করে

~ www.amarboi.com ~

জার্মানে তার বেড়ে ওঠা, সেখানকার ইতিহাস, ধর্ম, ঐতিহ্য, চিন্তা-চর্চার একটা গভীর প্রভাব রয়েছে। প্রশ্ন তোলেন—একটি স্থানের বিশেষ ইতিহাস, ঐতিহ্যের ভেতর থেকে জন্ম নেয়া কোন চিন্তা বিতর্কের উর্ধ্বে বিশ্বজনীন হতে পারে কি-না? চিন্তার সাথে স্থানিকতার এই সম্পর্কের ভাবনা এই বইয়ের আরেকটি চাবি যা আমার মনের বন্ধ দরজা খোলে।

দরজা আরো খোলে দীপেশের ইতিহাস ১ এবং ইতিহাস ২ এর ধারণায়। তার মতে, ইতিহাস ১ হচ্ছে পুঁজির হয়ে ওঠার ইতিহাস। পুঁজির বিকাশ এবং পূর্বশর্তের ইতিহাস। 'a past posited by capital as part of its precondition (Chakrabarty: 2007, p. 63) হচ্ছে ইতিহাস ১। কিন্তু ইতিহাস ২ হচ্ছে পুঁজির না-হয়ে উঠতে পারার ইতিহাস। পুঁজিকে তার যাত্রা-পথে এমন পরিস্থিতিতে পড়তে হয় যেটা পুঁজির নিজস্ব যুক্তিকে বাধা দেয়। সে পরিস্থিতি পুঁজির পুনরোৎপাদনে সাহায্য করে না। পুরো পৃথিবী পুঁজির অধিকারে আসে না। সেসব পুঁজির না-হয়ে উঠার ইতিহাস পুঁজির ইতিহাসেরই অংশ যা পুঁজির সঙ্গে সঙ্গেই চলে কিন্তু পুঁজির সাথে তৈরি করে নানাবিধ সম্পর্ক। কখনো সে পুঁজির বিরোধিতা করে, কখনো নিরপেক্ষ থাকে। ফলে বস্তুত পুঁজি তার যাত্রা-পথে অনেক কিছুকেই জয় করতে পারে না। যা কিছু সে জয় করতে পারে না সেগুলো নিয়েই ইতিহাস ২। ইতিহাস ১ এর গভীরে যদি থাকে আধুনিকতার গল্প, ইতিহাস ২ এ আছে বিকল্প আধুনিকতার ইশারা। ভারতের কোন এক নিউক্লিয়ার সাইন্টিস্ট সকালে পূজা দিয়ে দিন শুরু করেন। এক অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক ছাড়েন না প্রাক-আধুনিক বিশ্বাসকে। ভারতীয় শ্রমিক কিছুতেই ত্যাগ করতে পারে না তার বহু প্রাক-পুঁজিবাদী অভ্যাস, আত্মস্থ করতে পারে না নতুন পুঁজিবাদী কর্ম-শৃঙ্খলাকে ভারতীয় মানুষের এই আচরণ নিয়ে বিপাকে পড়ে ওয়াল স্ট্রিট জর্নালের তাত্ত্বিক লেখেন যে, 'ভারতীয়রা একই সাথে নানা শতাব্দীতে বসবাস করে।' পুঁজিবাদ, সাম্রাজবাদ, বিশ্বায়নের নতুন যুক্তির সাথে ভারতীয়দের খাপ খাইয়ে নেবার যে চড়াই উৎড়াই সংগ্রাম সেটাই ইতিহাস ২ এর অংশ। দীপেশ ইতিহাস ২ এর নানা উদারহণ দিয়ে দেখান—কি করে আধুনিকতার কথিত স্বতঃসিদ্ধ স্তম্ভগুলো নানা অর্থ নিয়ে হাজির হয়েছে ভারতে। একটি তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত টানবার জন্য পদ্ধতিগত কারণে উদাহরণগুলো দীপেশ প্রধানত দিয়েছেন তার চেনা বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের জীবন-যাপন থেকেই।

আধুনিকতার একটি শর্ত হচ্ছে ব্যক্তি-পরিসর এবং জন-পরিসরের পার্থক্য করতে পারা। ইউরোপে লেখা আত্মজীবনী ব্যক্তির ব্যক্তি হয়ে উঠার দলিল হিসেবে বিবেচিত, যেখানে সচেতনভাবে মানুষ তার Private-self এবং Public-Self কে আলাদা করে নেয়। অথচ ভারতীয়দের লেখা নানা আত্মজীবনীর উদাহরণ দিয়ে দীপেশ দেখিয়েছেন—সেগুলো যত না নিজের কথা তার চেয়ে

~ www.amarboi.com ~

অনেক বেশি অন্যের, তার পরিবেশের, জাতীয় জীবনের কথা। বাঙালি তার Private-self এবং Public-Self-কে কখনোই কথিত আধুনিক অর্থে পৃথক করে উঠতে পারেনি। আধুনিকতার আরো দাবি আবেগ আর যুক্তিকে আলাদা করতে পারার দক্ষতা। কিন্তু দীপেশ রামমোহন আর বিদ্যাসাগরের সতীদাহ প্রথা বিলোপের মতো একটি আধুনিক প্রকল্পে কীভাবে আবেগ আর যুক্তিকে সমন্বয় করেছেন তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসের উদাহরণ থেকে তিনি দেখান আবেগ আর কর্তব্যবুদ্ধির দ্বন্দ্ব। যে দ্বন্দ্বের প্রকৃতি ফ্রয়েডিয়ান দ্বন্দ্বের চেয়ে ভিন্ন। এমনি আরো বিবিধ উদাহরণ দিয়ে দীপেশ প্রমাণ রাখেন কি করে একটা বিশেষ জনগোষ্ঠী আধুনিকতার নানা ধারণাগুলোর সাথে ভিন্ন ভিন্নভাবে মোকাবেলা করছে। এই ভিন্ন মোকাবেলার সবচেয়ে চমৎকার উদাহরণ তার বাঙালির 'আড্ডা' নিয়ে লেখা অধ্যায়টি। আড্ডার এক অসাধারণ ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে দীপেশ দেখিয়েছেন আধুনিকতার দাবি মেটাতে গিয়ে কীভাবে ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন স্থানে, ভিন্ন জনগোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন পথ এবং সংগ্রামকে বেছে নিয়েছে। মার্ক্সের বিমূর্ত শ্রমের বিমূর্ততা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন দীপেশ। ভারতের যে শ্রমিক ফ্যাক্টরির গেট দিয়ে ঢুকে আট ঘণ্টা শ্রম দেয় সে তার সাথে করে পুঁজির সার্বজনীন ইতিহাসকে বহন করে নিয়ে যায় যেমন তেমনি সে তার মনে, শরীরে একটা স্থানিক ইতিহাসকেও বহন করে নিয়ে কারখানায় ঢোকে। এই দুইয়ের ভেতর যে দ্বন্দ্ব চলে সেখানেই দীপেশের আগ্রহ, কারণ, এই দ্বন্দ্বের ভেতরই আছে ইতিহাস ২ এর বীজ। পুঁজি এক-স্থান থেকে অন্য-স্থানে যখন যাত্রা করে তখন সেই যাত্রাপথে সে তার নিজের রূপ খানিকটা বদলে 'অনূদিত' হয়ে যায়। যদিও পুঁজির ইতিহাস জোর-জবরদস্তির ইতিহাস কিন্তু তার জবরদস্তি পুরোটাই সফল হয় না, তাকে নতুন স্থানে অনেক ক্ষেত্রেই আপোষ করতে হয়, যেখানে সে অনূদিত হয়ে যায়। ইতিহাস ২ বস্তুত পুঁজির এই অনূদিত হয়ে যাবার ইতিহাস। নানা জায়গায় পুঁজির এই অনুবাদের বৈচিত্র্যই জন্ম দিতে পারে অনেকগুলো ইতিহাস ২। ইতিহাস ২ আমাদের এমন একটা পরিসর দেয় যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা বলতে পারি পৃথিবীতে বাঁচার রকম শুধু একটি নয়, অনেক। এই ইতিহাস ২ আমাদের ইঙ্গিত দেয় মানবিক বৈচিত্র্যের, আধুনিকতার বহুত্বের সম্ভাবনার। সম্ভাবনা তৈরি করে স্থানিক ইতিহাস সংলগ্ন রাজনীতির। দীপেশ যাকে বলেন, politics of belonging (Chakrabarty: 2007, p. 63,66-67). কিংবা Plural ways of being in the world (Chakrabarty: 2007, p.101)। ইতিহাস ২-এর এই ধারণা আমাকে চমৎকৃত করে।

এই সূত্র ধরেই দীপেশ শেষে আঘাত করেন 'সময়'-এর প্রচলিত ধারণাটিকেও। আধুনিকতার প্রবণতা অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতকে আলাদা করে দেখা। কিন্তু দীপেশ ভারতীয় ইতিহাসবিদ কোসাম্বির একটি কৌতূহলোদ্দীপক

~ www.amarboi.com ~

উদাহরণ থেকে 'বর্তমান' ধারণাটি মোকাবেলা করেন। কোসাম্বী একবার বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন যে, কীভাবে আধুনিক ভারতীয় কোন রান্নাঘরে একইসাথে অতি আধুনিক ইলেকট্রিক স্টোভ এবং প্রস্তর যুগের 'পাটা পুতা'সহ অবস্থান করে। সেই পাটাকে নিয়ে নানা ব্রতও পালন হয়। এই যে দূর অতীত এবং নিকট বর্তমান একটা সময়ে একইসাথে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে এই সূত্র ধরেই দীপেশ প্রমাণ রাখেন—কি করে বর্তমান সময় বস্তুত একাধারে বহু সময়কেই ধারণ করে। 'বর্তমান' স্বয়ম্ভু কোন একক সময় নয়। বর্তমানের ভেতরই অতীত গ্রথিত আছে। অতীত কখনোই মৃত নয়। দীপেশ আফ্রিকার কেনিয়াত্তা এবং আধা-আফ্রিকান আধা-স্কটিস আপ্পিয়াহর উদাহরণ টেনে দেখান, শুধু ভারত নয় পৃথিবীর অন্য অঞ্চলও বস্তুত একইসাথে অনেকগুলো শতব্দীতে বসবাস করে। আসলে যে কোন একটা সময়ে বরাবরই জট পাকিয়ে থাকে অনেকগুলো সময়। ফলে সময় আসলে 'সময় গ্রন্থি'। অথচ আধুনিকতার একটা প্রধান দাবি হচ্ছে বর্তমানকে অতীত থেকে মুক্ত করে একটা সত্যিকার চূড়ান্ত বর্তমানকে খোঁজা। দাবি এই যে, আধুনিক হতে হলে অতীত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে হবে। এমন ধারণা করা হয় যে, যার ভেতর অতীতের কোন অনুষঙ্গ রয়ে গেছে সে প্রাক-আধুনিক, সে অসম্পূর্ণ। দীপেশ বলছেন সময়কে একটা ধারাবাহিক এবং একক ব্যাপার হিসেবে দেখলেই শুধু কোন কিছুকে অসম্পূর্ণ বলা যেতে পারে। আমরা যদি 'সময়গ্রন্থির' সত্যতা মেনে নিই, ধরে নিই যে বর্তমান সবসময়েই খণ্ডিত তাহলে অতীতের উপাদান নিয়েও একজন ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠী সম্পূর্ণ হতে পারে। বর্তমানের ভেতর অতীত গ্রথিত থাকা মানে এই নয় যে, অতীতের টানের জয় হওয়া, সেখানে ফিরে যাওয়া। দীপেশ বলেন, বস্তুত অতীতের ভেতরই গ্রথিত থাকে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত।

এর সঙ্গে আছে ইতিহাস ২ ধারণার যোগাযোগ। ইতিহাস ২ ধারণা দেয় একটা জনগোষ্ঠী কি করে আধুনিক ধারণাগুলোর সাথে মোকাবেলা করেছে। জানায়—সেই ধারণাগুলোর কোথায় জয় ঘটেছে কোথায় পরাজয়। জানায়—পুঁজি কোথায় কীভাবে অনূদিত হয়ে গেছে। সেই ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখবো যে, সেই ভিন্ন ইতিহাস থেকে শুধু একটা বিশেষ ভবিষ্যত তৈরি হবে না যাকে বলা যাবে A Future। অতীতের এই ভিন্নতার ভেতরই রয়ে গেছে বহু ভবিষ্যতের সম্ভাবনা। আমাদের বর্তমানের ভেতর রয়ে গেছে ইতিহাস ২ এর সেই ভিন্ন ভিন্ন মোকাবেলার চিহ্ন এবং সেগুলোর তত্ত্ব তালাশ করলে আমরা পেয়ে যেতে পারি আমাদের ভবিষ্যতের ইশারা। তখন হয়তো দেখতে পাবো—সর্বগ্রাসী ভবিষ্যত বলে কিছু নেই। অতীতের মতো ভবিষ্যতও হতে পারে বহু। অন্য-অতীত থেকে আমরা পৌঁছাতে পারি অন্য-ভবিষ্যতে। সে ভবিষ্যত শুধু ইউরোপের বেঁধে দেয়া ভবিষ্যত নয়। যাত্রা করতে পারি বিকল্প আধুনিকতার দিকে।

~ www.amarboi.com ~

দীপেশের এই আধুনিকতার বহুত্বের ধারণাকে বিশেষ করে মার্ক্সবাদীরা আক্রমণ করেছেন এই বলে যে, এতে করে পুঁজিবাদের শোষণ, বঞ্চনার যে সার্বজনীনতা আছে তাকে খর্ব করা হয়। তারা বলেছেন, স্থানিকতার এই ধারণা আসলে প্রতিক্রিয়াশীল। কোন কোন তাত্ত্বিক বলেছেন, পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য এই স্থানিকতার ভিন্নতাকেই অস্বীকার করতে হবে। এই যুক্তির পাল্টা মতো দীপেশ তার বইয়ের নতুন সংস্করণের ভূমিকাতেও রেখেছেন (Chakrabarty: 2007, p. xvii)। দীপেশ এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, যেখানেই যেতে চাই না কেন যাত্রা শুরু করতে হয় কোন স্থান থেকেই, শূন্য থেকে নয় [৪]। যে স্থান থেকে যাত্রা শুরু করছি সেখানে আমার আগেও বহু মানুষ ছিলো এবং এই স্থানে থাকবার অনেক সূত্র, ইশারা পরম্পরায় তারা রেখে গেছেন। বুদ্ধিমান যাত্রিক অতীতের সেই গোপন সূত্রগুলো খুঁজে নিজের সমসাময়িক ভাবনাকে সেই অনুযায়ী সাজিয়ে নেবে সেটাই কাম্য। যে স্থানের শান্তি কল্যাণের কথা ভাবছি সে স্থানের চরিত্রটি বুঝে নেয়া জরুরি। শুধু সার্বজনীনতার তত্ত্ব দিয়ে সেই স্থানকে বোঝা যাবে না, স্থানিকতার শর্তে ফিরতে হবে। সেজন্যই স্থানের গুরুত্ব। স্থানের অতীত অভিজ্ঞতাকে বর্তমানের ভেতর জারিত করে বৈশ্বিক মাত্রায় রূপান্তরই হবে লক্ষ্য।

পুঁজির সার্বজনীন এবং সর্বগ্রাসী ইতিহাস ১ এর ছোবল থেকে বেরিয়ে আসা ইতিহাস ২ এর দিকে চোখ রাখলে দীপেশ কথিত সেই Diverse ways of being human কথাটির মর্ম বোঝা যায়। 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' কথা সত্য বটে। কিন্তু কবিতার এই সবার উপরের মানুষটির চেহারা কেমন? সে মানুষটি কি হ্যাট-কোট-পড়া একজন শেতাঙ্গ মানুষ নাকি সবার উপরের সেই মানুষটির থাকতে পারে ভিন্ন-ধরনের জীবন-যাপন, সংবেদনশীলতা? মানুষের অভিজ্ঞতার বহুত্বকে মেনে নিলে মানুষের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের বহুত্বকেও মেনে নিতে হয়। মেনে নিতে হয় আধুনিকতার বহুত্বের সম্ভাবনাও। Diverse ways of being human কথাটি এভাবেই আমার কাছে আবেদন তৈরি করে।

সেই কথার সূত্র ধরেই দীপেশ চীনের বেইজিং-এ দেয়া একটা বক্তৃতায় মোক্ষম এক প্রশ্ন তুলেছেন[৫]। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন এই যে, চীন আর ভারত পৃথিবীর মহাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে বলে দাবি করা হচ্ছে, সেই শক্তির ভিত্তিটা কি? তিনি প্রশ্ন তুলেছেন চীন বা ভারত অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত এবং সামরিক শক্তিতে শাক্তিশালী হবার সাথে সাথে মানুষ এবং সমাজ সম্পর্কে বিশ্বের সামনে নতুন কোন দর্শন হাজির করতে পারছে কি? ইউরোপ যখন ঔপনিবেশিককালে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো তখন সে বিশ্বের কাছে 'সভ্যতা' নামের এক নতুন ধারণা নিয়ে এসেছিলো। যারা তার শক্তির কাছে পরাজিত হয়েছে তারা এই সভ্যতার ধারণাকে নিয়ে তর্কবিতর্ক করেছে। চীন বা ভারত যখন ইউরোপের চাইতে শক্তিশালী হয়ে উঠছে তখন তারা সেই ইউরোপের কাছে

~ www.amarboi.com ~

এমন কোন নতুন ধারণা কি হাজির করতে পারছে যা নিয়ে ইউরোপ তর্ক করতে পারে? দীপেশ আক্ষেপ করেছেন যে, তেমন কোন নমুনা দেখা যাচ্ছে না। বরং দেখা যাচ্ছে—চীন এবং ভারত অথনৈতিক, প্রযুক্তিগত, সামরিক এবং দার্শনিকভাবে নেহাত ইউরোপকেই অনুসরণ করে তাদের পথেই শক্তি সঞ্চয় করছে মাত্র। তারা বস্তুত এক নতুন ইউরোপ হয়ে ওঠারই পায়তারা করছে। সমাজ, সভ্যতার নতুন কোন ধারণার জন্ম দিচ্ছে না।

দীপেশ বলেন—যে কোন ধারণার একটি 'বর্ণনামূলক' (Discursive) মাত্রা থাকে, আরেকটি থাকে 'রূপগত' (Figurative) মাত্রা। ধরা যাক 'গণতন্ত্র'। এই ধারণাটির একটি 'বর্ণনামূলক' মাত্রা আছে ঠিকই কিন্তু যখনই এর প্রয়োগ ঘটছে কোন বাস্তব প্রেক্ষিতে তখন তার 'রূপগত' মাত্রাটি যাচ্ছে বদলে। ভারতের উৎসবমুখর জাতীয় গণতান্ত্রিক নির্বাচনের দিনের সাথে অস্ট্রেলিয়ায় নিরুত্তাপ জাতীয় নির্বাচনের দিনের ব্যাপক পার্থক্য দীপেশকে ভাবিয়েছে। তার এই আলোচনার সূত্র ধরে ভাবা যেতে পারে 'গণতন্ত্রের' একটি কোন বিশেষ রূপগত মাত্রাকেই যদি সার্বজনীন ভাবা যেতে পারে তাহলে এ নিয়ে অনিশ্চয়তা কমে। বলা যেতে পারে—ইউরোপীয় 'গণতন্ত্রের' ধারণাকেই চূড়ান্ত ধরে নিয়ে সে পথে এগিয়ে যাওয়াই সব রাষ্ট্রের কর্তব্য। কিন্তু 'গণতন্ত্রের' বহুত্বের ধারণার কথা তুলতে গেলে সমস্যা দাঁড়ায় এই যে, এ থেকে নিশ্চিত কোন রাজনৈতিক পদক্ষেপের 'রোড ম্যাপ' পাওয়া যায় না। গণতন্ত্র, মানবিক অধিকার, আধুনিকতা এসব ধারণার ভিন্ন ভিন্ন রূপকে মেনে নিলে সংকট তৈরি হয় কোন রূপটি সঠিক সেই সিদ্ধান্তের অনিশ্চয়তার, আশঙ্কা থাকে বিশৃঙ্খলার। এ-কারণেই সার্বজনীন ধারণার ভেতর সবসময়েই থাকে একটা নিশ্চিতির বোধ, কারণ, এর অঙ্কটি তুলনামূলকভাবে স্পষ্ট। অন্যদিকে বহুত্বের ধারণার অঙ্ক অজানা; ফলে সেখানে বরাবর থাকে অনিশ্চয়তা আর ভীতির বোধ। বিকল্প আধুনিকতার ধারণাটির ঝুঁকি এখানেই। কিন্তু এই অনিশ্চিত, বিপদজনক অথচ সম্ভাবনাময় পথের ইশারা আমাকে তাড়িত করে।

আমি এই ধারণার প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পাই—আমার নিজের বিশ্বস্বাস্থ্য গবেষণার ক্ষেত্রেও। ঐতিহাসিকভাবে গণতান্ত্রিক ধারণার সবচেয়ে অগণতান্ত্রিক প্রয়োগ ঘটেছে ভারতে আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রসারের ইতিহাসে[৬]। বিশ্বস্বাস্থ্য বিষয়ক নানা প্রকল্পে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি—কি করে স্বাস্থ্য বিষয়ক নানা সার্বজনীন ধারণাকে বিতর্কের উর্ধ্বে রেখে প্রয়োগ করা হচ্ছে পৃথিবীর নানা প্রান্তে। আমার নিজের গবেষণার একটি বিষয় 'মুমূর্ষু রোগীর সেবা', চিকিৎসা বিজ্ঞানে যার একটি বিশেষ শাখা রয়েছে 'প্যালিয়াটিভ কেয়ার' নামে। বিশ্বের গড় আয়ু বেড়ে যাওয়াতে এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অগ্রগতি সাধিত হওয়াতে পৃথিবীজুড়ে এখন এক বিশাল সংখ্যক মানুষ মুমূর্ষু অবস্থায় দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে।

~ www.amarboi.com ~

এই মুমূর্ষু রোগী যাদের আর সুস্থ হবার কোন সম্ভাবনা নেই তাদের সেবা এখন চিকিৎসাবিজ্ঞানের দিক থেকে এবং অর্থনীতির দিক থেকে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে। পশ্চিমা দেশগুলো এই মুমূর্ষু রোগীর সেবার জন্য হসপিস নামের বিশেষ হাসপাতাল তৈরি করেছে। এই সব হাসপাতালের মাধ্যমে তারা মানুষের 'Good Death' বা ভালো মৃত্যু নিশ্চিত করতে চায়। কিন্তু প্রশ্ন থাকে 'ভালো মৃত্যুর' কোন সার্বজনীন সংজ্ঞা হতে পারে কিনা। পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠানিকভাবে 'মুমূর্ষু রোগীর সেবা' দেয়াকেই ভালো মৃত্যু নিশ্চিত করার উপায় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। দেখা গেছে ভালো মৃত্যুর যে সংজ্ঞা পশ্চিমা গবেষকরা তৈরি করেছেন তা তৈরি হয়েছে ইউরোপীয় আধুনিকতার ব্যক্তির চূড়ান্ত কর্তৃত্বের ধারণাকে ভিত্তি করে। দি ইকোনোমিক্স পত্রিকা সম্প্রতি পৃথিবীর কোন দেশে মৃত্যুর মান কেমন তার বিচার বিশ্লেষণ করে একটা তালিকা করেছে যার শীর্ষে রয়েছে ব্রিটেন, কারণ, ব্রিটেনে রয়েছে সবচেয়ে উন্নত প্রাতিষ্ঠানিক প্যালিয়েটিভ সেবা এবং হসপিস [৭]। আমি আমার বিশ্বস্বাস্থ্যের অধ্যয়ন-অভিজ্ঞতা থেকে এই ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে প্রধান লেখক হিসেবে বিশ্বস্বাস্থ্যের একটি মর্যাদাবান পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছি [৮]। আমি সেই প্রবন্ধে তর্ক তুলেছি যে ভালো মৃত্যুর এধরনের তালিকা তৈরির পেছনে দীপেশের 'প্রভিন্সিয়ালাজিং ইউরোপের' সেই 'ইতিহাসের বিশ্রামাগারের' ধারণাটা সুপ্ত রয়েছে। একটি সার্বজনীন ভালো মৃত্যুর ধারণাকে স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিয়ে সকলকে আহ্বান করা হচ্ছে সেই সার্বজনীন সংজ্ঞাটিকে অনুসরণ করার। অথচ আমি মাঠ গবেষণার উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছি ভারতের কেরালায় একটি বিশেষ প্রকল্প অত্যন্ত সফলভাবে হাসপাতালের বাইরে জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে মুমূর্ষুদের সেবা দেয়ার মাধ্যমে ভালো মৃত্যু নিশ্চিত করার বিকল্প পথ তৈরি করেছে। কারণ, তাদের ভালো মৃত্যুর সংজ্ঞা ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, বরং ভিন্নতর সামষ্টিক মূলবোধ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। আমি আমার নিবন্ধে তর্ক তুলেছি যে, ভালো মৃত্যুর ধারণার বস্তুত দুটো দিক আছে। একটি হচ্ছে Value অর্থাৎ কাকে বলছি ভালো মৃত্যু তার সংজ্ঞা, আরেকটি হচ্ছে Logistic বা সেই ভালো মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক এবং সামাজিক প্রস্তুতি। আমি বলেছি Diverse ways of being এর মতো রয়েছে Diverse ways of dying। পৃথিবীর নানা প্রান্তের জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব Value এবং Logistic এর বোঝাপড়ার ভিত্তিতে নিশ্চিত করতে পারে ভালো মৃত্যু। সেজন্য তাদের অত্যাধুনিক হসপিস তৈরি করার অপেক্ষায় 'ইতিহাসের বিশ্রামাগারে' বসে থাকবার দরকার নেই। আমি ভালো মৃত্যুর বহুত্বের ধারণার কথাই বলতে চেয়েছি। এটি আমার জন্য বিশেষ আনন্দের ব্যাপার যে, দীপেশ চক্রবর্তীর ধারণাকে আমার জানা-মতে বিশ্বস্বাস্থ্য গবেষণায় আমি প্রথম ব্যবহার করেছি।

~ www.amarboi.com ~

সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাসের বাইরে বিশ্বস্বাস্থ্যের মতো আরো নানা ক্ষেত্রে দীপেশের ভাবনা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিককালে দীপেশ তার ভাবনাকে প্রয়োগ করছেন বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের সংকটের ক্ষেত্রেও। তিনি বরাবর জনগোষ্ঠীর ইতিহাসের যে ভিন্নতার কথা বলে আসছেন 'ক্লাইমেট চেঞ্জ' বিষয়ক সংকটে বরং দেখা যাচ্ছে ভিন্নতা নয় মানবজাতি হিসেবে তার ঐক্যের দিকেও নজর দেয়ার প্রয়োজন পড়ছে। কারণ, এই জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত জাতি ধর্ম নির্বিশেষে গিয়ে পড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের এই সংকট আধুনিকতার ইউরোপীয় ধারণাকে নতুন এক সংকটে ফেলে দিয়েছে। দেখা গেছে, জলবায়ু পরিবর্তনের এই সংকটের বীজ রোপিত হয়েছে ইউরোপীয় আধুনিকতা ধারণার বীজ-বপনের পথ ধরে। সভ্যতার নামে যে আধুনিকতার ধারণা ইউরোপ সারা পৃথিবীতে নিয়ে গেছে, সেই সভ্যতা প্রতিষ্ঠার অন্যতম পথ ছিলো প্রকৃতিতে নিজের স্বার্থে যথেচ্ছ ব্যবহার করা। প্রকৃতি ধ্বংসযজ্ঞের সূত্রপাত আধুনিকতার ইউরোপীয় ধারণার প্রয়োগের সাথে সাথেই। দীপেশ তার নতুন কাজে সমাজ ইতিহাস বিষয়ক ভাবনাকে প্রাকৃতিক ইতিহাসের সাথে যুক্ত করে ইউরোপকে আরো প্রান্তিক করে তুলছেন।

২০১৭ সালে বেড়াতে গিয়েছিলাম দীপেশ দার বাড়ি। শিকাগোতে দীপেশ দার বাড়ির পাশের লেক মিশিগানের কিনার ধরে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছিলাম তার ভাবনা জগত নিয়ে। মনে আছে দীপেশ দা বলছিলেন, 'সত্যি বলতে কি প্রভিন্সিয়ালাইজিং ইউরোপ আমার আত্মার প্রতিবাদ। এই বইয়ের আবেদন তাই বুঝি আমার কাছে শুধু মনন নয় আত্মার কাছেও। সেই সন্ধ্যায় তার বাড়িতে গানের আসর বসেছিলো। দীপেশ দার সাথে গলা মিলিয়ে গেয়েছিলাম বাংলাদেশের মাউজভাণ্ডারি গান :

নদীতে জোয়ার হয় যখন, তিন প্রকারের পানি আসে লাল কালা সাদা বরন।
সেই নদীতে মরা কুমির হাজার ডিম্ব পারতাসে।
কামেলিরা কাম করিয়া কোথায় জানি লুকাইছে...

ভাবি, মরা কুমির আবার হাজার ডিম প্রসব করে কি করে? একি তাহলে অসম্ভবের ভেতর সম্ভাবনার বহুত্বের ইঙ্গিত?

তথ্যসূত্র

[১] ভদ্র, গৌতম ও চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (সম্পা.) (১৯৯৮), নিম্নবর্গের ইতিহাস, কোলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স
[২] চক্রবর্তী, দীপেশ (২০১২), ইতিহাসের জনজীবন ও অন্যান্য প্রবন্ধ, কোলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স
[৩] Chakrabarty, D., (2007). Provincializing Europe: Post colonial Thought and Historical Difference, Princeton and Oxford, Princeton University Press

~ www.amarboi.com ~

[৪] Browning,G., Prokhovnik, R., and Demova-Cookson, M (Eds). (2012) Dialogues with Contemporary Political Theorists, Palgrave

[৫] Chakrabarty, D. (2012), From civilization to globalization: the 'West' as a shifting signifier in Indian modernity, Inter-Asia Cultural Studies, 13:1. 138-152

[৬] Arnold, D. (1993), Colonizing the Body: State Medicine and Epidemic Disease in Nineteenth-Century India, University of California Press.

[৭] The Economist (2015), *The 2015 Quality of Death Index: Ranking palliative care across the world.* Retrieved from http://www.eiuperspectives.economist.com/healthcare/2015-quality-death-index.

[৮] Zaman, S. Inbadas, H., Whitelaw, A. and Clark, D., (2016). Common or multiple futures for end of life care around the world Ideas from the'waiting room of history. *Social Science and Medicine*, 172, pp.72-79. doi: 10.1016/j.socscimed.

(এ লেখাটি ২০১৮ তে প্রকাশিত আমার 'গুগল গুরু' বইতে অন্তর্ভুক্ত।)

আমার বই

~ www.amarboi.com ~

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যে উপনিবেশবাদের নির্মাণ : দীপেশ চক্রবর্তীর চিন্তার আলোকে

(জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে তৈরি সংগঠন 'বোধিচিত্তের' আমন্ত্রণে 'উপনিবেশ নির্মাণ : চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য' এই শিরোনামে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলাম ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। বক্তৃতার পর মুক্ত আলোচনা হয়েছিলো। আলাপটি করেছিলাম দীপেশ চক্রবর্তীর 'প্রভিন্সিয়ালাইজিং ইউরোপ' বইটির সুত্র ধরে। রেকর্ডকৃত বক্তৃতা এবং আলোচনার শ্রুতিলিখন করেছেন রাব্বী আহমেদ। আলোচনার কথ্য-রূপে অনেক ক্ষেত্রেই বাক্যের অসম্পূর্ণতা, পুনরাবৃত্তি থাকে ফলে এর লিখিত রূপ দিতে গিয়ে বেশ কিছু পরিমার্জনা করতে হয়েছে। সীমিত সময়ের ভেতর এবিষয়টি সম্পর্কে প্রাথমিক একটি আলোচনা হয়েছে মাত্র এবং অনেক প্রসঙ্গ এবং ধারণার বিস্তার ঘটানো সম্ভব হয়নি। বক্তৃতায় প্রয়াশই বাংলা ইংরেজির মিশ্রন ঘটেছে। প্রেক্ষাপট বলতে গিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে এ বইয়ে অন্তর্ভুক্ত 'আমার দীপেশ আবিষ্কার' লেখাটির কিছু প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যাবে। আলাপটির অনানুষ্ঠানিক মেজাজটি বিবেচনায় রেখেই লেখাটি পাঠের অনুরোধ রইল।)

বোধিচিত্তকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এখানে উপস্থিত হবার জন্যে। আমার ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে বলা হয়েছে। আরেকটু হয়তো বলা যেতে পারে। আমি মূলত পড়াশোনা করেছি চিকিৎসা-বিজ্ঞানে। তারপর কিছুটা যূথভ্রষ্ট হয়ে ডাক্তারি ঠিক সে অর্থে করিনি, কিন্তু আমি জ্ঞানজগতে ঢোকার চেষ্টা করেছি। আমি পাবলিক হেলথে পড়াশোনা করেছি, পরে পিএইচডি করেছি মেডিকেল অ্যানথ্রোপলজিতে। আমি মেডিকেল থেকে মেডিকেল অ্যানথ্রোপলজিতে যোগ দিয়েছি যেটা আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে একটু উদ্ভটই বলা যেতে পারে। চিকিৎসা-বিজ্ঞান থেকে নৃবিজ্ঞানে সরে আসাটা এক ধরনের পাগলামিই হয়তো। পরবর্তীকালে আমি মূলত চিকিৎসা নৃবিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষকতা এবং গবেষণা কাজে জড়িত হয়েছি। বিশ্বস্বাস্থ্যের নানা দিক নিয়ে আমি গবেষণা করি। আফ্রিকা এবং সাউথ এশিয়ার কয়েকটা দেশে আমি গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করি। বর্তমানে আমি ব্রিটেনের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছি। ব্রিটেনে যাবার আগে আমি দীর্ঘদিন

~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশের ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছি। তবে আপনাদের অনেকেই হয়তো আমার একাডেমিক কাজের চেয়ে আমার সাহিত্যকর্মের সাথে বেশি পরিচিত। হ্যাঁ, সাহিত্য আমার প্যাশনের জায়গা এবং আমার কাজের একটা বড় ক্ষেত্র। এ প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের একটা কথা মনে পড়ছে। উনি বলেছিলেন, কাণ্ড তিন রকম। কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড আর রসকাণ্ড। আমি তিন ধরনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গেই কমবেশি জড়িত। কিন্তু আমার স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের জায়গা হচ্ছে রসকাণ্ড, সাহিত্য। কিন্তু শিক্ষকতা ও গবেষণার কারণে আমাকে জ্ঞানকাণ্ডেও সক্রিয় থাকতে হয়। আজকে যে আলোচনা, সে আলোচনার প্রেক্ষিতে আমার পেছনের প্রেক্ষাপটটা একটু বলে রাখলাম। আমি মূলত রসকাণ্ডের মানুষ, কিন্তু রসকাণ্ডের কাজকর্ম করতে হলে জ্ঞানকাণ্ডে তো বিচরণ করতে হয়। এছাড়া, আমার গবেষণা ও শিক্ষকতার বিষয় হচ্ছে বিশ্বস্বাস্থ্য। তো সে প্রেক্ষিতে হয়তো কিছু কথা বলা যাবে এ প্রসঙ্গে। আমি প্রায়ই কাজের সূত্রে দেশে আসি এবং তখন এধরনের আসরের সুযোগগুলো নেয়ার চেষ্টা করি। এতে নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের সাথে যোগাযোগের একটা সুযোগ হয়। বোধিচিত্তের ব্যাপারে খুব বেশিদিন হয়নি আমি জেনেছি এবং জেনে আমি খুবই অনুপ্রাণিত। এমনিতে সাধারণ অর্থে আমাদের দেশে চিন্তা চর্চার প্ল্যাটফর্ম তো বেশি নেই। বিশেষ করে তরুণদের ভেতরে। বোধিচিত্তের কর্মকাণ্ডে আমি দেখেছি যে তারা জ্ঞানকাণ্ডের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে বেশ ভেতরে গিয়ে জানার চেষ্টা করেন। তারা এ বিষয়গুলো যারা চর্চা করছেন তাদেরকে আমন্ত্রণ জানান এবং তাদের কথা শোনেন। তাছাড়া বাংলায় এ চর্চাগুলো করা হয় যা আমি জরুরি মনে করি। বিশেষ করে আমরা এমন একটা সময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি যখন বাংলাদেশকে জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে বোঝা খুবই জরুরি।

আজকের বিষয়, উপনিবেশবাদের নির্মাণ এবং চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য। উপনিবেশবাদের নির্মাণ নিয়ে তো অনেক চিন্তকরা কাজ করেছেন। এ বিষয়ে দীর্ঘদিনের কর্মকাণ্ড আছে, গবেষণা আছে, লেখা আছে, তত্ত্ব আছে। আমি যেটা করবো, খুব সংক্ষেপে একজন বিশেষ ইতিহাসবিদের চিন্তার উপরে ভিত্তি করে আমার আলাপকে দাঁড় করাবো। যার কথা বলছি তিনি এসময়ের খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন চিন্তক, যাকে আমি আমার কাজের ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক মনে করি, তিনি দীপেশ চক্রবর্তী। বিশেষ করে আমি তাঁর 'প্রোভিনশিয়ালাইজিং ইউরোপ' বইটির প্রেক্ষিতে কথা বলবো। সেই বইটির ভেতরে তিনি যে প্রস্তাবনাগুলো করেছেন সেই প্রেক্ষিতে আমি চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গে কিছু কথা বলবো।

ঔপনিবেশিক সময়ের যে ভারত, সেই সময়ের স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা বিষয়ে ডেভিড আর্নল্ডের চমৎকার কাজ আছে, 'কলোনিয়ালাইজিং দ্যা বডি' নামের বইটাতে। এছাড়াও আরও কয়েকজন গবেষক কাজ করেছেন এ বিষয়ে। সে বিষয়ে কথা বলবো। সেই সঙ্গে সাম্প্রতিক কালের আরেকটি চিকিৎসা প্রসঙ্গ নিয়ে

~ www.amarboi.com ~

কথা বলবো, যা আমার নিজের গবেষণার জায়গা, সেটা হচ্ছে, 'প্যালিয়েটিভ কেয়ার', বা 'এন্ড অফ লাইফ কেয়ার'। বাংলায় বলা যায় মুমূর্ষু রোগীর উপশম সেবা। আমি একদিকে চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাসে এবং অন্যদিকে সাম্প্রতিক স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণায় কীভাবে উপনিবেশিক ধারণাগুলো কাজ করছে সে ব্যাপারে বলার চেষ্টা করবো।

দীপেশ চক্রবর্তী সম্পর্কে আপনারা অনেকে নিশ্চয়ই জানেন। উনি মূলত সাব-অল্টার্ন তাত্ত্বিক দলেরই একজন সদস্য। তবে পরবর্তীকালে তিনি সাব-অল্টার্নের যে মূল প্রস্তাব, 'হিস্ট্রি ফ্রম দ্যা বিলো' সেই প্রস্তাবকে আরও অন্য একটি ধাপে নিয়ে গিয়েছেন। বৃহত্তর অর্থে ইউরোপিয়ান চিন্তা প্রক্রিয়াকেই ক্রিটিক্যালি দেখার চেষ্টা করেছেন তার 'প্রোভিনসিয়ালাইজিং ইউরোপ' বইটাতে। বইটি ২০০০ সালে প্রকাশিত হয়েছিলো। পরে ২০০৭ সালে তিনি আরেকটি সংস্করণ প্রকাশ করেন যেখানে তিনি আরো কিছু নতুন চিন্তা যোগ করেন। এটা একটা জটিল তাত্ত্বিক বই এবং নানা প্রসঙ্গে, নানাভাবে এ বইয়ে তিনি ইউরোপীয়

চিন্তার যে সৌধ, সেটাকে আঘাত করবার চেষ্টা করেছেন বা বিনির্মাণ করার চেষ্টা করেছেন। ইউরোপীয় চিন্তাকে এক ধরনের সমালোচনামূলক দৃষ্টি দিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছেন। সেটা সামগ্রিকভাবে এই সময়ের ভেতরে, এই প্রেক্ষাপটে, এই পরিস্থিতিতে আলাপ করবার সুযোগ নেই। আমি খুব সংক্ষিপ্তভাবে এ বইয়ের বিষয় সম্পর্কে মোটাদাগে কিছু কথা বলতে চাই। সেটা আজকের এই স্বাস্থ্যের আলোচনার সাথেও সম্পর্কিত।

বলা যায় যে, বইটিতে উনি মূলত তিনটা না-বোধক প্রস্তাব করেছেন। প্রথমত, তিনি বলছেন যে ইউরোপ একটা বিশেষ ভৌগোলিক এলাকা শুধু নয়, ইউরোপ একটা চিন্তা প্রক্রিয়া। এটা একটা মাইন্ড-সেট। এটা কোন ভূগোল না। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট এলাকার চিন্তা প্রক্রিয়া কীভাবে সারা পৃথিবীর প্রধান চিন্তা প্রক্রিয়া হয়ে উঠলো সেটারই তত্ত্ব তালাশ তিনি করেছেন। যেটা দাঁড়িয়েছে— ইউরোপিয়ান এবং নন-ইউরোপিয়ান সবাই এখন ইউরোপিয়ান হয়ে উঠেছে, চিন্তার দিক থেকে। কীভাবে সেই ইউরোপিয়ান অরিজিনেটেড চিন্তাই সারা পৃথিবীর চিন্তা হিসেবে দাঁড়ালো সেটার তিনি একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই বইতে। দ্বিতীয় যে কথাটি তিনি বলছেন তা হলো, ইতিহাসও কোন ধারাবাহিক, স্তরে স্তরে এগিয়ে যাওয়া প্রক্রিয়া না। এমন না যে, পৃথিবীর সমস্ত সমাজ একই প্রক্রিয়ায়, একেকটা ধাপ পেরিয়ে একই গন্তব্যে গিয়ে পৌঁছাবে। তৃতীয় কথাটা তিনি বলছেন, সময় নিয়ে। সময়ও কোন এক রৈখিক বা লিনিয়ার একটা প্রপঞ্চ না। যে কোন একটা বিন্দুর সময় আসলে অনেকগুলো সময়ের জট পাকানো একটা প্রপঞ্চ। সময় শুধু অতীত বর্তমান হয়ে ভবিষ্যতের দিকে যায় না। যে কোন একটা বর্তমানের ভেতরে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত জট পাকিয়ে থাকে, উনি যাকে বলছেন 'টাইম নট'। সময়গ্রন্থি বলা যেতে পারে। এখন এই সূত্র ধরে উনি তার

~ www.amarboi.com ~

পুরো বইটায় নানা রকম অধ্যায়ের ভেতর দিয়ে এই ভাবনাগুলোর বিস্তার ঘটিয়েছেন। আমি খুব সংক্ষেপ করে বলছি।

তার লেখায় উনি চমৎকার একটা ইমেজ তৈরি করেছেন। উনি বলছেন 'ওয়েটিং রুম অফ হিস্ট্রি'। ইউরোপের ওই চিন্তার ভেতরে যে ভাবনাটা তারা তৈরি করেছে সেটাকে বলা যেতে পারে 'ওয়েটিং রুম অফ হিস্ট্রি'। বলা যেতে পারে ইতিহাসের বিশ্রামাগার। সেটা কেমন? এই ইউরোপীয় চিন্তার বা মডার্নিস্ট চিন্তার মূল যে দাবি সেটা হচ্ছে যে, আধুনিকতার যে মূল স্তম্ভগুলো, মূল উপাদানগুলো যেমন ধরা যাক রাষ্ট্র-ধারণা, মানবাধিকারের ধারণা, প্রাইভেট-সেলফ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, বাক-স্বাধীনতা এই যে ধারণাগুলো, এর জন্ম এবং বিকাশ ইউরোপে। পরবর্তীকালে এই সব আধুনিক ধারণা পৃথিবীর অ-ইউরোপীয় দেশগুলোতে ছড়িয়ে গেছে বা ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে ইউরোপীয়দেরই মাধ্যমে। তবে এখানে বলে রাখা দরকার ইউরোপ কথাটাকে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। কারণ, ইউরোপের ভেতরও নানা ভাগ রয়েছে। এখানে মূলত ইউরোপের প্রাক্তন কলোনিয়াল দেশগুলোর কথাই বলা হচ্ছে। তো সেই ইউরোপীয় প্রস্তাব অনুযায়ী পৃথিবীর অন্যান্য অ-ইউরোপীয় অঞ্চলগুলোতে এখনও আধুনিকতার এইসব ধারণাগুলো বিকশিত হয়নি। তাদের সমাজগুলো প্রাক-আধুনিক উপাদানের ভেতরেই আছে। তাদের ভেতরে আধুনিকতার মূল এই উপাদানগুলো তৈরি হয়নি, শর্তগুলো পূরণ হয়নি। প্রস্তাব হচ্ছে ইউরোপে আধুনিকতার যে স্তম্ভগুলো তৈরি হয়েছে সেগুলো ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলগুলোয় বিকশিত হতে হবে। এবং তা বিকশিত হবার জন্য তাদেরকে কতোগুলো প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে হবে। ধরা যাক শিক্ষা, নানা রকম ইন্সটিটিউশন ইত্যাদি তৈরি করতে হবে। তারা যদি নানা প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে আধুনিকতার সেই উপাদান গুলো, স্তম্ভগুলো তাদের সমাজ-জীবনে, রাষ্ট্র-জীবনে আনতে পারে তাহলেই তারা আধুনিক হিসেবে গ্রাজুয়েট হবে, বিবেচিত হবে। এবং যতো দিন সেটা না হচ্ছে, ততোদিন তারা একটা ইমাজিনারি ওয়েটিং রুম অফ হিস্ট্রির ভেতর বসে থাকবে। তারা সেই কাল্পনিক বিশ্রামাগারের ভেতর বসে যথার্থ আধুনিকতার জন্য প্রস্তুত হবে। যেমন, ধরা যাক জন স্টুয়ার্ট মিল, ব্রিটিশ চিন্তক, তিনি মনে করতেন যে, কোন একটা রাষ্ট্রের বা মানবগোষ্ঠির সর্বোচ্চ অর্জন হচ্ছে স্বাধিকারের অর্জন। তারা নিজেরা নিজেদেরকে শাসন করবে। স্ব-শাসনের ক্ষমতা অর্জন। কিন্তু তিনি আফ্রিকার এবং এশিয়ার মানুষদেরকে সেই স্বাধিকারের অধিকার দিতে প্রস্তুত ছিলেন না কলোনিয়াল টাইমে। কারণ তিনি বলেছেন যে-না, তারা প্রস্তুত না এখনও। নট ইয়েট রেডি। এবং তাদেরকে কতোগুলো প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে হবে। যেমন বলছিলাম যে, শিক্ষার হার বাড়াতে হবে, কতোগুলো ইনস্টিটিউশন তৈরি করতে হবে, তারপরে তারা স্বাধিকার অর্জন করবার মতো দক্ষতা অর্জন করলে তাদের সেই অধিকার দেয়া যেতে পারে। অর্থাৎ তাদেরকে

~ www.amarboi.com ~

আরো কিছুকাল ওয়েটিং রুম অফ হিস্ট্রিতে থাকতে হবে। ওয়েটিং রুম অফ হিস্ট্রিতে থেকে তাদেরকে প্রস্তুত হতে হবে। একটু অন্যভাবে বললে বলা যেতে পারে যে, তুমি প্ল্যাটফর্মে এসেছো ঠিক আছে কিন্তু আধুনিকতার ষ্টেশনে যাবার যে ট্রেন, সেই ট্রেনটায় উঠবার মতো যথেষ্ট ভাড়া তোমার জোগাড় হয়নি। তোমাকে আরো ওয়েটিং রুমে থাকতে হবে, থেকে প্রস্তুত হতে হবে, ভাড়াটা জোগাড় করতে হবে, তাহলে তুমি আধুনিকতার ট্রেনে উঠতে পারবে। এই হচ্ছে সাধারণভাবে ওয়েটিং রুম হিস্ট্রির যে দৃশ্যকল্প তিনি তুলে ধরেছেন তার ব্যাপার। কিন্তু যেটা দেখা যায়, পুরো উপনিবেশ-বিরোধী যে আন্দোলন, তার মুল দ্বন্দ্বটাই ছিলো এই যে একদিকে ঔপনিবেশিক শাসকরা বলছেন, দে আর নট রেডি ইয়েট। কিন্তু অন্যদিকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রেরা বলছে যে, না। আমরা প্রস্তুত আছি। আমরা এখনই স্বাধীনতা চাই। এই দ্বন্দ্বটাই ছিলো নট ইয়েট এবং নাউ এর ভেতরে। উপনিবেশের মানুষরা বলেছে যে আমরা ইতিহাসের ওয়েটিং রুমে বসে থাকতে চাই না। উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলনের এই পুরো প্রক্রিয়ার ভেতরেই ছিলো ইতিহাসের ওয়েটিং রুমে বসে থাকা এবং না-থাকার দ্বন্দ্ব।

এইসূত্রে তিনি দুটো ধারণাকে উপস্থাপন করেছেন। হিস্ট্রি ওয়ান আর হিস্ট্রি টু। মোটাদাগে ইতিহাস এক হচ্ছে পুঁজির জয়ের ইতিহাস। উপনিবেশিক দেশগুলোর সমাজে এমন কিছু শর্ত ছিলো যা পুঁজির বিকাশ, আধুনিকতার ধারণাগুলো বিকাশে সহয়তা করেছে। আমি পুঁজি এবং আধুনিকতা কথা দুটাকে ইন্টারচেঞ্জিবলি ব্যবহার করছি। উপনিবেশের সমাজে পুঁজির বিকাশে কিছু প্রিকন্ডিশন ছিলো। সেই সূত্রে সেখানে পুঁজি বিকশিত হয়েছে। সুতরাং ইতিহাস এক হচ্ছে পুঁজির জয়ের ইতিহাস। কিন্তু সেই সমাজের ভেতরেই আবার এমন কিছু উপাদান ছিলো যা পুঁজির বিকাশকে ব্যাহত করেছে। পুঁজির বিকাশ হতে দেয়নি। পুঁজিকে একটা পিছুটান দিয়েছে। ইতিহাস দুই হচ্ছে পুঁজির সেই পরাজয়ের ইতিহাস। পুঁজি এবং সেই সূত্রে আধুনিকতার ধারণাগুলো সমাজের ভেতরেই সেই বাধাগুলোর জন্য একটু বেঁকে গেছে। দীপেশ এই বেঁকে-যাওয়াকে বলেছেন ট্রান্সস্লেটেড বা অনূদিত হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ সেই সব সমাজের নানা শর্তের কারণে আধুনিকতার ধারণাগুলো ট্রান্সলেটেড হয়ে একটা ভিন্ন রূপ নিয়েছে। কারণ, সেখানে এমন কিছু শর্ত ছিলো যা পুঁজি এবং আধুনিকতার ধারণাগুলোকে সামনে এগিয়ে নিতে দেয়নি। সেই শর্তগুলো হচ্ছে—ইতিহাস দুইয়ের অংশ। এই নন-ইউরোপীয় সমাজগুলো পুঁজির ধারণাকে মোকাবেলা করেছে নানাভাবে। এখন কথা হচ্ছে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইতিহাস একের ওপরই আমাদের সব মনোযোগ থাকে। কীভাবে পুঁজি জয় করেছে। কিন্তু পুঁজির যে পরাজয়ের জায়গাগুলো, পুঁজি যেখানে জয় করতে পারেনি সেই জায়গায় মনোযোগ আমরা কম দিয়েছি। এখন এই ইতিহাস দুয়ের ভেতর আছে আমাদের স্থানিক ইতিহাস। ভাবতে হবে কেন পুঁজি পারেনি ওই জায়গাটা জয় করতে।

~ www.amarboi.com ~

সেখানকার নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠির যে অভিজ্ঞতা তার কিছু কিছু উপাদান পুঁজির জয়কে ঠেকিয়ে দিয়েছে। পুঁজিকে সেই জনজীবনের সাথে মিলিয়ে আধুনিকতার ধারণাগুলোকে এডাপ্ট করতে হয়েছে। এবং এই জায়গাতেই একটা চাবি আছে আমাদের ভবিষ্যত ভাবনার।

কীভাবে পুঁজির ধারণাগুলো বা আধুনিকতার ধারণাগুলো অনূদিত হয়ে গেছে তার নানারকম উদাহরণ দীপেশ উল্লেখ করেছেন। ধরা যাক, মার্ক্সের যে অ্যাবস্ট্রাক্ট লেবারের ধারণা, তা মার্ক্স যেভাবে ভেবেছেন ভারতবর্ষে সেভাবে কাজ করেনি বরং তা অনূদিত হয়ে নতুন রূপ নিয়েছে দীপেশ তার বইয়ে তার বিস্তারিত আলাপ করেছেন। কিংবা ধরা যাক, আধুনিকতার একটা বড় ধারণা হচ্ছে প্রাইভেট সেলফ। ব্যক্তির ধারণা তৈরি হওয়া। পাশ্চাত্যে এই ব্যক্তি হয়ে উঠবার ম্যানিফেস্টেশন ঘটেছে অটোবায়োগ্রাফি লেখার ভেতর দিয়ে। মানুষ সেখানে আত্মজীবনী লিখতে শুরু করলো। আত্মজীবনীর ভেতর ব্যক্তি সামষ্টিক আইডিয়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে ব্যক্তির ব্যক্তি হয়ে উঠবার ইতিহাস তৈরি করেছে। প্রোভিনসিয়ালাইজিং ইউরোপ বইয়ে দীপেশ ভারতবর্ষে, বিশেষত বাংলায় উনবিংশ শতাব্দীর বেশকিছু আত্মজীবনী নিয়ে আলোচনা করেছেন। যেমন প্রসন্নময়ী দেবীর আত্মজীবনী। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সেইসব আত্মজীবনী লেখার ধরণ একেবারে অন্যরকম। ইউরোপিয়ান আত্মজীবনীর চরিত্রের সাথে তার মিল নাই। সেই আত্মজীবনীর ভেতরে আত্মের কথা যতো আছে, নিজের কথা যতো আছে তার চেয়ে বেশি আছে অন্যের কথা। আছে পরিবারের কথা, সমাজের কথা। নিজের কথা পাঁচ ভাগ হয়তো আছে। ওখানে ব্যক্তিকে দেখা যায় 'মোর এজ এ কালেকটিভ বিয়িং' ঠিক ইন্ডিভিজুয়াল বিয়িং' না। সেলফটা ওখানে মোর রিলেশনাল সেলফ, রেদার দ্যান ইন্ডিভিজুয়াল সেলফ। তাহলে দেখা যাচ্ছে বাংলায় আত্মজীবনীর মতো একটা আধুনিক সাহিত্য-ধারা তৈরি হয়েছে ঠিকই কিন্তু এই আত্মজীবনীর ভেতরের ব্যক্তি ঠিক ইউরোপীয় ব্যক্তি না। আধুনিকতার ধারণা হিসেবে আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু তার চরিত্রটা একদম অন্যরকম। ইউরোপের চরিত্রের না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তৈরি হয়েছে, কিন্তু এখানকার মাটির অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে সেই ব্যক্তি বদলে গেছে, হয়ে উঠেছে অন্য রকম ব্যক্তি, ঠিক ইউরোপীয় ব্যক্তিসর্বস্ব ব্যক্তি নয় বরং সমষ্টিকে বিবেচনায় রাখা এক ব্যক্তি। অথবা ধরা যাক, আধুনিকতার আরেকটা বড় দাবি হচ্ছে যে, আবেগের উপর যুক্তির প্রাধান্য। সুপ্রিমেসি অফ র‍্যাশনালিটি। আবেগ এবং র‍্যাশনালিটিকে আলাদা করতে হবে। আধুনিক যে-কোন ইনস্টিটিউশন করতে হলে, আধুনিক কোন প্রকল্প করতে হলে, সেটা র‍্যাশনালিটির ভিত্তিতে হতে হবে, সেখানে ইমোশন ইত্যাদির জায়গা নাই। দীপেশ নানা উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছেন যে, কীভাবে বাংলায় নানা আধুনিকতার প্রজেক্টে আবেগ বড় ভূমিকা পালন করেছে। যেমন ধরা যাক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহের যে আন্দোলন সেটা

~ www.amarboi.com ~

একটা মডার্নিস্ট আন্দোলন, আধুনিক আন্দোলন। কিন্তু সেখানে বিদ্যাসাগর শুধু যুক্তি দিয়ে কাজ করেননি। বিদ্যাসাগরের কাজের একটা বড় অস্ত্র ছিলো কান্না। উনি পাবলিকলি কাঁদতেন। সংজ্ঞা অনুযায়ী একজন আধুনিক মানুষ পাবলিকলি কান্নাকাটি করতে পারেন না। কিন্তু বিদ্যাসাগর ইমোশনকে টুলস হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তার প্রকল্পকে সফল করার জন্য তিনি শুধু মানুষের যুক্তির উপর নির্ভর করেননি, আবেগকেও ব্যবহার করেছেন। তিনি এই আধুনিক ধারণাকে প্রচার করতে গিয়ে অনেক সনাতন শাস্ত্রকেও ব্যাবহার করেছেন। তাতে তিনি সফল হতে পেরেছেন। এটা নেহাত আরেকটা উদাহরণ যে, কীভাবে একটা মডার্নিস্ট ধারণা ভারতে এসে অনূদিত হয়ে যাচ্ছে। এই সূত্র ধরেই দীপেশ বাঙালির আড্ডা নিয়ে চমৎকার একটা চ্যাপ্টার লিখেছেন তার বইয়ে।

কাজের সূত্রে আমাকে নানা দেশে যেতে হয়। ভারতে এক ডাক্তারকে জানি যিনি একটা গাড়ি কিনে, ধরা যাক ফোর্ড গাড়ি, তো সেই গাড়ি বাসায় এনে চালাবার আগে পুরহিতকে দিয়ে গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে নিয়েছেন, ফুল চন্দন দিয়ে সাজিয়েছেন। আমি জানলাম যে এটা ভারতে কমন একটা প্রাকটিস। তো এখন কীভাবে একে ব্যাখা করবো আমি? এই যে আচরণ একে আমি কীভাবে বুঝবো? এভাবে হয়তো ভাবা যায় যে, এই যে ভারতে ফোর্ড গাড়ির প্রবেশ হচ্ছে এটা পুঁজির জয়ের ইতিহাস, এটা পুঁজির বিকাশের ইতিহাস যা হচ্ছে হিস্ট্রি ওয়ান, কিন্তু যখন একজন পুরহিত দিয়ে আমি গাড়িটাকে ধুয়ে নিচ্ছি সেটা হয়ে যাচ্ছে হিস্ট্রি টু। গাড়ির মতো একটা পণ্যকে আমি এখানকার এক প্রাক-আধুনিক চর্চার ভেতর দিয়ে মিশিয়ে তাকে গ্রহণযোগ্য করে তুলে নিচ্ছি। এটাতো সে অর্থে কোন আধুনিক-চর্চা না। তাও এই চর্চাটা করছেন একজন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ডাক্তার। আধুনিকতার মূল কথা হচ্ছে সবরকম প্রাক-আধুনিকতার উপাদান থেকে যখন আমরা বিচ্যুত হতে পারবো তখনই আমরা সত্যিকারের আধুনিক হয়ে উঠতে পারবো। দীপেশ এই ধারণাকেও ক্রিটিক করছেন এবং এখানেই তার সময় বিষয়ক প্রস্তাবের প্রাসঙ্গিকতা আছে। তিনি যে কথটা বলছেন যে সময় আসলে একটা লিনিয়ার প্রপঞ্চ না। সময় শুধু অতীত থেকে বর্তমান হয়ে ভবিষ্যতের দিকে যায় না। যেকোন একটা টাইম ফ্রেমকে যদি আমরা ধরি, সেটার ভেতরে জট পাকিয়ে থাকে অনেকগুলো সময়। এখন ডাক্তারের এই ফোর্ড গাড়িটাকে কেন্দ্র করে যে রিচুয়াল এর ভেতরে কিন্তু দুইটা সময় জট পাকিয়ে আছে। একই-সাথে এর ভেতর এই সময়ের টেকনোলজির ডেভেলপমেন্টের ইতিহাস আছে আবার তার সাথে যুক্ত হচ্ছে হাজার বছরের পূজা অর্চনার বিশ্বাসের ইতিহাস। এখন এভাবে গাড়িকে গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে দেয়ার ব্যাপারটাকে আমি কুসংস্কার বলতে পারি, প্রাক-আধুনিক উপাদান বলতে পারি, কিন্তু সেই উপাদান এখন এই বর্তমান সময়ের ভেতরেই যুক্ত হয়ে আছে। যেটা বলা হয় যে, আমাদের এই পাক ভারত উপমহাদেশে আপনি একইসাথে অনেকগুলো শতাব্দীতে বসবাস করতে পারবেন।

~ www.amarboi.com ~

একইসাথে আপনি এমন ব্যাপার দেখবেন যা টোয়েন্টিফার্স্ট সেঞ্চুরির আবার এমন সব ব্যাপার আছে যা হয়তো ফিফটিন সেঞ্চুরির।

দীপেশ বলছেন ভালোভাবে খেয়াল করলে দেখা যাবে এটা শুধু ভারতীয় অঞ্চলের ব্যাপার না , বরং ইউরোপের বহু দেশের ক্ষেত্রেও তা সত্য। আসলে অ্যাবসোলিউট বর্তমান বলে কোথাও কিছু নাই। যা আছে তা হচ্ছে বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যত মেলানো একটা নট বা গ্রন্থি। ভারতীয় ইতিহাসবিদ কুসাম্বের একটি আলোচনা উল্লেখ করেছেন দীপেশ—যেখানে ভারতীয় রান্নাঘরে একই সময়ে কি করে ইলেকট্রিক ষ্টোভ আর প্রস্তর যুগের পাটা-পুতা সহাবস্থান করে তা নিয়ে কোসাম্বী বিস্ময় প্রকাশ করছেন। স্কটিশদের কার্পেটে ওয়াইন ফেলে দেয়ার রিচুয়ালের কথা বলেছেন, যাতে পূর্ব-পুরুষরা পান করতে পারে। তো, এসব ভিন্ন আলোচনার ব্যাপার। আপাতভাবে এগুলো কুসংস্কার কিন্তু গভীরভাবে দেখলে বোঝা যাবে কীভাবে বর্তমানের ভেতর অতীত গ্রথিত থাকে এসব তার উদাহারণ। এই পর্যবেক্ষণকে আমরা ব্যবহার করতে পারি ইতিহাস দুই কে বুঝবার জন্য। কারণ, এর ভেতরই একটা জনগোষ্ঠীর স্থানিকতা বুঝবার চাবি আছে। বর্তমানের গায়ে লেগে থাকে অতীত যেমন কোদালের গায়ে লেগে থাকে মাঠের কাদা। বলার কথা হচ্ছে কোন না কোনভাবে আমাদের বর্তমানে অতীতের চিহ্ন লেগে আছে। একটা জনগোষ্ঠী হাজার বছরের নানা ইতিহাসের পরিক্রমায় পথ চলে নুতন নতুন অভিঘাতে সেই জনগোষ্ঠীর জীবনে পরিবর্তন আসে কিন্তু তারপরও সে তার অতীতের কিছু কিছু উপাদানগুলো বহন করে চলে। এই যে অতীতের উপাদান সেগুলোকে নিয়ে আমরা কি করবো? সেগুলোকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দেবো? একজন ট্রাক ড্রাইভার যখন গাড়ি চালাচ্ছেন তখন সেখানে গাড়ির ভেতরে একটা কাগজে সুরা ঝুলিয়ে রাখেন। কিংবা ইন্ডিয়ায় দেখেছি ট্যাক্সির ভেতর মূর্তি ঝোলানো, লেবু ঝোলানো ইত্যাদি। এসবকে আমরা কীভাবে বুঝবো? আমরা কি এভাবে ব্যাপারটা বুঝবো যে যেদিন তাদের গাড়ির ভেতর থেকে ঐ মূর্তিটাকে, ঐ সুরার কাগজকে বিদায় করা যাবে সেদিন এই মানুষগুলো যথার্থ আধুনিক হয়ে উঠবে? নাকি অন্যভাবেও এই ব্যাপারগুলো বোঝার সুযোগ আছে আমাদের? দীপেশ বলছেন, এগুলোকে নেহাত কুসংস্কার হিসাবে না দেখে অতীতের ইশারা হিসেবে দেখা যেতে পারে। দেখা যেতে পারে ইতিহাস দুয়ের অংশ হিসেবে যেখানে পুঁজি জয় করতে পারেনি। ধর্মকে শুধু কুসংস্কার হিসেবে দেখার ব্যাপার নেই। সাঁওতালরা যখন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন তখন তারা তাদের বনের দেবীর দোহাই দিয়ে সে লড়াই করেছেন। তাদের দেবী তাদের রাজনৈতিকি লড়াইয়েরও সহযোদ্ধা। এসব আসলে একটা স্থানের বৈশিষ্ট বুঝতে সহায়তা করে। ঐ বৈশিষ্ট্যের ভেতর সেই স্থানের ভবিষ্যতেরও ইঙ্গিত আছে। ফলে ভারতবর্ষের যে আধুনিকতা তা তার স্থানিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতেই হতে পারে, তাকে ইউরোপের আধুনিকতা অনুসরণ করবার কোন দরকার নাই। এই সূত্রেই

~ www.amarboi.com ~

দীপেশ আধুনিকতার প্লুরালিটি বা বহুত্বের কথা বলেছেন। ইউরোপ সমগ্র মানবজাতির জন্য একটা নির্দিষ্ট ভবিষ্যতের ভাবনা দিয়ে রেখেছে, সব মানবগোষ্ঠীর গন্তব্য যেন ইউরোপীয় সমাজের মতো একটা সমাজ। ভবিষ্যতের একটা নির্দিষ্ট ভিশন তারা তৈরি করেছে। আধুনিকতার ট্রেনটা যেন একটা নির্দিষ্ট স্টেশনেই যাচ্ছে। কিন্তু এমনও তো হতে পারে তাদের বেধে দেয়া স্টেশনে আমরা যাবো না। অন্য একটা স্টেশনের দিকে আমরা যাত্রা করবো। আমাদের আধুনিকতাটা হবে অন্যরকম। ভেবে দেখতে হবে তার সম্ভাবনা আছে কি-না।

এখন সেই বিকল্প আধুনিকতার কথা যদি আমরা ভাবতে চাই, তাহলে আমাকে আমার স্থানিক অভিজ্ঞতাকে গভীরভাবে দেখতে হবে। আমার বুঝতে হবে আমাদের এই অঞ্চল কীভাবে আধুনিকতার এবং পুঁজির সাথে মোকাবেলা করেছে। সেই সব মোকাবেলার চিহ্ন কাদার মতো এখনও আমাদের জীবনে লেগে আছে। আমাদের ভাবতে হবে সেইসব চিহ্ন থেকে আমরা আমাদের নিজস্ব আধুনিকতার সূত্র পেতে পারি কি-না? সেটা একটা বিকল্প আধুনিকতা হতে পারে যা ইউরোপের দেখিয়ে দেয়া পথে হবে না। এখানে আধুনিকতার বহুত্বের ধারণাটা চলে আসে। দীপেশ বারবার রিপিট করেছেন যে, 'দেয়ার আর ডাইভার্স ওয়েজ অফ বিয়িং ইন দিস ওয়ার্ল্ড।' এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার বিভিন্ন রূপ আছে। আমরা এরকম একটা চিন্তায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি যে পাশ্চাত্যের সমাজ, রাষ্ট্র এবং বেঁচে থাকার রূপটাই বোধহয় একমাত্র এবং শ্রেষ্ঠ রূপ। এই যে ইউনেভার্সেলাইজেশন, এই ইউনিভার্সেলাইজেশনের বিপদ নিয়ে ভাবার কথা বলছেন দীপেশ। এখন এই মূল দ্বন্দ্বটা তৈরি হয় ইউনিভার্সেলাইজেশন এবং পার্টিকুলারাইজেশনের ভেতর। আমি একটা স্থানের ভেতরে কীভাবে ইউনিভার্সাল আইডিয়াগুলোকে চর্চা করবো। এটা জটিল প্রায়োগিক এবং দার্শনিক সংকট। ধরা যাক মানবাধিকার, একটা ইউনিভার্সাল আইডিয়া। এই মানবাধিকার ধারণাটার রূপ কি একই সব জায়গায়? ধরা যাক, ব্রিটেনে মানবাধিকার ধারণাটা ঠিক যেভাবে প্রাকটিস হয় ঠিক সেভাবে আমাদের দেশে চর্চার জন্য যে ধরনের ইনস্টিটিউশনাল এবং হিস্ট্রিকাল প্রিপারেশন লাগে সেটা কি আমাদের আছে? ব্রিটেন নামের যে দেশ আমরা আজকে দেখছি এ দেশ তৈরি হয়েছে কয়েক শতাব্দী ধরে। এই দেশের আজকের রূপের পেছনে আছে শত শত বছরে ঔপনিবেশিক শাসন, শোষণের ইতিহাস। এখন দুশ বছরের ঔপনিবেশিক ইতিহাসকে বাদ দিয়ে আমরা কি ব্রিটেনের মতো একটা রাষ্ট্র বানাতে পারবো? এটা আদৌ কি সম্ভব? উপনিবেশের ইতিহাস ছাড়া ব্রিটেন হওয়া সম্ভব? যদি তা অসম্ভব মনে হয় তাহলে আমাদের অন্য উপায় ভাবতে হবে। আমাদের রাষ্ট্রের জন্য তখন আমাদের একটা বিকল্প ভিশন তৈরি করতে হবে।

এই প্রেক্ষিতেই দীপেশ বলছেন যে কোন একটা আইডিয়ার একটা ডিসকার্সিভ উপাদান থাকে, আরেকটা ফিগারেটিভ উপাদান থাকে। ডিসকোর্সের

~ www.amarboi.com ~

ভেতরে জিনিসটা এক রকম কিন্তু সেটা যখন বাস্তবায়িত হচ্ছে, যখন তার একটা ফিগারেটিভ রূপ তৈরি হচ্ছে তখন সেই রূপটা কি একই রকম? নাকি সে রূপ বহু হতে পারে? 'সবার ওপরে মানুষ সত্য তাহার ওপরে নাই' এটা ডিসকোর্স। একদিকে খুবই সত্য কথা। অবশ্য ক্লাইমেট চেঞ্জের বিবেচনায় এটা খুবই পলিটিক্যালি ইনকারেক্ট কথা। জীবজগতের সবার উপর মানুষকে সত্য ভাবার বিপদ আছে। কিন্তু সেটা অন্য প্রসঙ্গ। এই বিখ্যাত লাইনটা এর প্রচলিত অর্থেই বরং আপাতত দেখি। সেই প্রেক্ষিতে আমি যদি আরেকটু গভীরভাবে ভাবি যে, যে মানুষটার কথা এখানে বলা হচ্ছে, কে এই মানুষ? এটা কি হ্যাট-কোট পরা একজন মানুষ নাকি লুঙ্গি-পাঞ্জাবি-পরা একজন মানুষ। মানুষ একটা এ্যাবস্ট্রাক্ট ধারণা, কিন্তু সেই এ্যাবস্ট্রাক্ট মানুষকে যখন ফিগারেটিভ ওয়েতে ভাবছি তখন কোন মানুষকে দেখছি আমি? 'শোন হে মানুষ ভাই, সবার ওপরে মানুষ সত্য তাহার ওপরে নাই'। এখন এখানে দুই রকম মানুষ। একজন মানুষকে এটা বলা হচ্ছে। তাকে এড্রেস করে বলা হচ্ছে যে মানুষ তুমি শোন। আবার তাকেই আরেকজন মানুষের ভিশন দেয়া হচ্ছে যে 'সবার ওপরে মানুষ সত্য'। এই দুই রকম মানুষ কারা? এখন এটা একটা ডিসকোর্স, ডিসকার্সিভ একটা ব্যাপার কিন্তু এটার ফিগারেটিভ রূপটা কি? কি রকম মানুষ আমরা দেখতে চাই? আমরা কি সবাই মিলে চেষ্টা করে হ্যাট-কোট পরা এক একজন মানুষ হবো। দুইশো বছর, পাঁচশো বছর পরে পৃথিবীর সব মানুষ কি কোকের বোতলের একই ধরনের মানুষ হবে? যাদের চলন বলন সব হবে ইউরোপীয়দের মতো? নাকি সেসব মানুষ ভিন্ন ভবিষ্যতের দিকেও যেতে পারে। মানুষ বিষয়ে ইউরোপীয় ভিশনের বাইরে কি আমরা কিছু ভাবতে পারি? আমরা কি অন্য রকম একটা আধুনিকতা তৈরি করতে পারি? অন্য রকম একটা সমাজ কি হতে পারে? সেটা কঠিন প্রশ্ন কিন্তু বিবেচনা করতে হবে। এর উত্তর খুঁজতে গেলে আমাকে আমাদের হিস্ট্রি টুয়ের দিকে খেয়াল করতে হবে। আমাদের এখানে আধুনিকতার জয়ের ইতিহাসটা কি আর আধুনিকতার পরাজয়ের ইতিহাসটাই বা কি তা ভেবে দেখতে হবে। সেই ইতিহাস দুইকে যদি আমরা খুঁজতে পারি তাহলে আমরা একটা ইঙ্গিত পেতে পারি যে, 'দেয়ার আর ডাইভার্স ওয়েজ অফ বিয়িং ইন দিস ওয়ার্ল্ড'। পৃথিবীতে অন্যরকম ভাবে বেঁচে থাকারও উপায় আছে? ভুটানের মানুষ কি সবাই তাহলে একদিন প্যারিসের মতো করে চলতে থাকবে? নাকি ভুটানও মানবজাতির ভবিষ্যত একটা রূপ হতে পারে? দার্শনিক প্রশ্ন। তো, সেই চিন্তা থেকেই মোটা দাগে আমরা এই সম্ভাবনার কথা কি ভাবি? যদি ভাবি তাহলে আমাকে ডিকলোনাইজেশনের ভাবনার দিকে যেতে হবে। এই যে আমাদেরকে ইউরোপীয় চিন্তা প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে বাধ্য করা হচ্ছে কিছু নির্দিষ্ট ইউনিভার্সাল আইডিয়াকে এডাপ্ট করতে সেগুলোকে ক্রিটিকালি দেখতে হবে। কারণ, চিন্তার ইতিহাসের সাথে স্থানিক অভিজ্ঞতার সম্পর্ক আছে।

~ www.amarboi.com ~

তবে দীপেশ পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন যে, ইউরোপীয় চিন্তকদের চিন্তার কাছে তার অনেক ঋণও আছে। তিনি বলছেন ইউরোপিয়ান চিন্তার মূল দুটি ধারা, একটি অ্যানালিটিকাল ধারা, ম্যাক্রো-লেভেলের ডিসকাশন যারা করেন, কার্ল মার্ক্স যার একজন বড় পুরোধা চিন্তক তার কাছে তিনি ঋণী। এবং আরেকটা চিন্তার ধারা হচ্ছে মাইক্রোলেভেলের, যেটা হারমিনিউটিক ফ্রেমওয়ার্ক, যা প্রাত্যহিক জীবনের দিকে নজর দেয়, হাইডেগার যার মূল পুরোধা, তার কাছেও তার অনেক ঋণ। কিন্তু তিনি বলছেন, যে ইউরোপিয়ান চিন্তা হচ্ছে ইনডিসপেন্সেবল কিন্তু ইনঅ্যাডিকুয়েট। অপরিহার্য, কারণ, বিশ্ব-ভাবনার জন্য ইউরোপিয়ান চিন্তার দ্বারস্থ আমাকে হতে হবে, কিন্তু তা অপর্যাপ্ত। ইউরোপীয় চিন্তা আমাকে অভিজ্ঞতার সব দিগন্তে নিয়ে যায় না। কিন্তু কীভাবে আমরা আমাদের স্থানিক অভিজ্ঞতা, স্থানিক চিন্তাকে বিশ্বজনীন নানা যে চিন্তা তার সঙ্গে যুক্ত করতে পারবো সেটা হচ্ছে একটা বড় কাজ। এখন সাউদার্ন এপিস্টেমোলজি নামে অ-ইউরোপীয় থিয়োরি নিয়ে কাজ করছেন অনেকে। তারা যে বিষয়টি বলছেন যে, ইউরোপ যেভাবে আমাদের পৃথিবীকে দেখতে শিখিয়েছে সেটাই পৃথিবীকে দেখবার একমাত্র পথ না। এবং কেউ কেউ এমন কথা বলছেন যে, আজকের পৃথিবী যেখানে এসে পৌঁছেছে, যে এপিস্টেমোলজি, বা জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এসেছে তা হচ্ছে ইউরোপীয় এপিস্টমোলজি, ফলে আজকের পৃথিবীর সংকট আসলে ইউরোপিয়ান এপিস্টেমোলজির পরিণতি। এই সংকটময় পরিস্থিতি তাহলে ইউরোপিয়ান এপিস্টেমোলজি দিয়ে, ইউরোপিয়ান ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে সমাধান করা যাবে না। আমাদের ফ্রেমওয়ার্কটা নতুন করে ভাবতে হবে। এবং সে জন্যে দরকার চিন্তার ডিকলোনাইজেশন, বি-উপনিবেশিকরণ। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এমনিই তো ইউরোপীয় চিন্তার আধিপত্য হেজিমনি যেটাকে বলে, সেটা এতো দাপটের যে সেই ডিলকলোনাইজেশন অব এপিস্টেমোলজি একটা কঠিন কাজ। সেখানে ভাষার ব্যাপার আছে, চিন্তার টুলের ব্যাপার আছে, রিসার্চ মেথোডলজির প্রশ্ন আছে। এগুলোতে নন-ইউরোপিয়ান দেশগুলো দুর্বল বলে, তারা তো নলেজ প্রোডিউস করে না, নলেজ কনজিউম করে শুধু। আমরা শুধু জ্ঞান আহরণ করি কিন্তু আমরা জ্ঞান উৎপাদন করি না। আমাদের গবেষণার দক্ষতা নাই, রিসোর্স নাই। পাশাপাশি এমন একটা ধারণায় আমাদের বসিয়ে রাখা হয়েছে যে এই নতুন নলেজের কোন জায়গাও নাই। এতক্ষণ খুব মোটাদাগে দীপেশের ভাবনার সূত্র ধরে আমাদের মন আর মননের জগতের উপনিবেশ প্রক্রিয়ায় কথা বললাম। এই প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় রেখে এবার আমি চিকিৎসা ক্ষেত্রে উপনিবেশ নির্মাণের দুটো উদাহরণের কথা বলবো। একটা চিকিৎসার অতীত ইতিহাস থেকে অন্যটা সাম্প্রতিক কালের একটা চিকিৎসার সেবা প্রসঙ্গে।

ঔপনিবেশিক আমলে ভারতবর্ষের যে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা তা নিয়ে কাজ করেছেন বেশ অনেকেই। ডেভিড আর্নল্ডের 'কলোনাইজিং দ্যা বডি' এ

~ www.amarboi.com ~

ক্ষেত্রে একটা প্রণিধানযোগ্য বই। আমরা যাকে অ্যালোপেথিক মেডিসিন বলি, বায়োমেডিসিন বলি সেটিই মূল ইউরোপীয় চিকিৎসা ব্যাবস্থা। উপনিবেশিক আমলের আগেই বেশ কিছু ইউরোপীয় ডাক্তার ভারতবর্ষে এসেছেন। ব্যক্তিগতভাবে তারা এখানে এসে ঘুরে গেছেন, এখানকার জীবন নিয়ে লিখেছেন। সম্রাট শাহজাহানের ব্যক্তিগত ডাক্তার ছিলেন ফ্রেঞ্চ একজন ডাক্তার ফ্রাসোয়া বার্নিয়ার। তার লেখা আত্মজীবনী আছে। সেসব ডাক্তার এখানকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে বিভিন্ন কাহিনি, স্মৃতিকথা এগুলো লিখেছেন। এখানকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে তাদের খুব বেশি একটা আগ্রহ ছিলো না। পরবর্তীকালে উপনিবেশের আমলে পাক-ভারত উপমহাদেশে, পশ্চিমা চিকিৎসা-ব্যবস্থা এসেছে দুটো পথ ধরে। একটা হচ্ছে উপনিবেশিক প্রশাসকদের পথ ধরে আর আরেকটা হচ্ছে ক্রিশ্চিয়ান মিশনারিদের হাত ধরে। মনে রাখতে হবে এ দু দলের কারোরই ভারতবর্ষে ইউরোপীয় চিকিৎসা-ব্যবস্থা প্রসারের প্রধান এজেন্ডা ছিলো না। এজেন্ডাটা ছিলো ভিন্ন। তারা মেডিকেল এজেন্ডা নিয়ে এই উপমহাদেশে আসেনি। তাদের উপনিবেশগুলোতে ইউরোপীয় চিকিৎসা-ব্যবস্থা তারা শুরুর দিকে চালু করেছে মূলত যারা প্রশাসক, কলোনিয়াল অফিসার তাদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে। ভারত ছিলো তাদের জন্য একটা রিমোট, এক্সোটিক জায়গা। তাছাড়া এখানে তখন বিচিত্র সব রোগ হয়, কালা-জ্বর, ম্যালেরিয়া, ডায়েরিয়া যেগুলো ইউরোপের লোক দেখেনি। রোগ ছিলো কলোনিয়াল অফিসারদের জন্য একটা বড় হুমকি। অন্যদিকে তাদের একটা বড় আর্মি ছিলো। ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আর্মি ছিলো, সেটা পরে ব্রিটিশ এমপায়ারের অধীনে যায়। ব্রিটিশ আর্মির অফিসার, সৈন্যদের স্বাস্থ্য রক্ষা করা ছিলো ইউরোপীয় ডাক্তারের আরেকটা প্রধান কাজ। বলা যায়, ভারতবর্ষে ওয়েস্টার্ন চিকিৎসা-ব্যবস্থা মূলত দুটা এনক্লেভের ভেতরে চর্চা হতো। একটা হচ্ছে ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে, আরেকটা হচ্ছে কলোনিয়াল অফিসারদের কোয়ার্টার্স-এ। আর এর বাইরে চর্চা হতো জেলের ভেতরে। এর বাইরে ভারতবর্ষের যে বিশাল সাধারণ মানুষ সেখানে পশ্চিমা মেডিসিনের কোন জায়গা ছিলো না। মূলত আয়ুর্বেদ, ইউনানি, সিদ্ধি, যোগ এবং আরও অনেক লোক চিকিৎসা সেখানে চলতো। সে অর্থে বলা যায় যে, ঐ সময়ের ভারতবর্ষের প্রধান চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিলো আয়ুর্বেদ এবং ইউনানি চিকিৎসা-ব্যবস্থা এবং ওয়েস্টার্ন মেডিসিন ছিলো অলটারনেটিভ মেডিসিন। কিন্তু আজকে যদি আপনি তাকান তাহলে দেখবেন যে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা হচ্ছে অল্টারনেটিভ চিকিৎসা, ইউনানি হচ্ছে অলটারনেটিভ মেডিসিন আর ওয়েস্টার্ন এলোপ্যাথিক মেডিসিন হচ্ছে মূল-ধারার চিকিৎসা-ব্যবস্থা। কি করে একটা অল্টারনেটিভ মেডিসিন মেইনস্ট্রিম মেডিসিন হলো সেই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া ডেভিড আর্নল্ড তার বইয়ে আলোচনা করেছেন। এটা শুধু পশ্চিমা মেডিসিনের কার্যকারিতার শক্তির জোরে হয়নি। এর পেছনে অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক শক্তি প্রয়োগের ব্যাপার

~ www.amarboi.com ~

আছে। নানা বলপ্রয়োগের প্রক্রিয়ায় ভারতবর্ষে ওয়েস্টার্ন মেডিসিন হয়েছে মেইনস্ট্রিম মেডিসিন, আর অন্য সমস্ত মেডিসিন হয়েছে অল্টারনেটিভ মেডিসিন।

অনেক লম্বা ইতিহাস সেটা কিন্তু খুব সংক্ষেপে বলতে পারি যে, ওয়েস্টার্ন মেডিসিন, ব্যারাক, অফিসার-পাড়া বা জেলের গন্ডি থেকে সাধারণ জনজীবনের ব্যবহৃত হবার ট্রিগারিং ঘটনা ঘটেছে মহামারিকে কেন্দ্র করে। এ অঞ্চলে বেশ বড় বড় তিনটা মহামারি হয়েছিলো সে সময়ে। একটা হচ্ছে স্মল পক্স বা গুটি-বসন্ত, একটা হচ্ছে কলেরা এবং আরেকটা প্লেগ মহামারী। এসব মহামারীতে শত শত লোক মারা যেতো। বিশেষ করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে কলেরার তিনটা বেশ বড় মহামারী হয়। যে মহামারীগুলো ব্রিটিশদের এখানকার মেডিকেল সিস্টেমের সাথে যে সম্পর্কের প্যাটার্নটা ছিলো সেটাকেই বদলে দিয়েছিলো। এখানে টেকনিক্যাল তিনটা টার্ম জেনে রাখা ভালো। পাবলিক হেলথের ক্ষেত্রে তিনটা টার্ম হচ্ছে এপিডেমিক, এন্ডেমিক এবং প্যান্ডেমিক। এন্ডেমিক মানে হচ্ছে কিছু কিছু রোগ একটা নির্দিষ্ট এলাকায় নিয়মিত বিরতিতে হয় কিম্বা সবসময়েই তার একটা প্রাদুর্ভাব থাকে। সেটা ঐ নির্দিষ্ট এলাকায় সবসময় থাকে। যেমন ধরেন, উত্তরবঙ্গের অনেকের গোয়টার থাকে। এই দিনাজপুর, রংপুর এলাকায়। ঐ এলাকায় গয়েটার, গ্রামে যাকে ঘ্যাগ বলে তার এন্ডেমিক আছে। আর এপিডেমিক হলো কোন একটা সাধারণ অসুখ কোন একটা এলাকায় স্বাভাবিক যে হারে হয় তার চেয়ে হঠাৎ বেশি হয়ে যাওয়া। কলেরা সবসময় হয়। বছরে হয়তো পাঁচশো লোক কলেরায় আক্রান্ত হয় কিন্তু হঠাৎ করে পাঁচ হাজার লোক আক্রান্ত হয়ে গেলো সেটাকে আমরা বলবো এপিডেমিক। আর, কিছু কিছু পরিস্থিতি হয় যখন ঐ একটা বিশেষ মহামারী একটা বিশেষ অঞ্চল ছেড়ে, একটা বিশেষ দেশ ছেড়ে প্রবাহিত হতে থাকে অন্য দেশের দিকে। মানে সীমানা পেরিয়ে অনেকগুলো দেশ একসাথে এফেকটেড হয়। সেটাকে বলে প্যান্ডেমিক। মাঝে এভিয়েন ফ্লু হলো। তো এই প্যান্ডেমিক বলা যায় যে, ভারতবর্ষের পুরো চিকিৎসার চিত্র বদলে দিয়েছিলো। সেই সাথে এটাও একটু মনে রাখতে হবে যে, রোগ এবং মহামারীর পার্থক্য আছে। রোগ হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল এক্সপেরিয়েন্স। আমার অসুখ হয়েছে আমি ব্যাক্তিগতভাবে এটাতে ভুগছি আর মহামারি হচ্ছে কালেক্টিভ এক্সপেরিয়েন্স। একটা পুরো জনগোষ্ঠী এ অবস্থা দিয়ে আক্রান্ত হচ্ছে। সুতরাং, এর পুরো বিষয়টার ভেতরে একটা কালেকটিভিটি আছে, যৌথতার ব্যাপার আছে। ফলে মহামারী এ অঞ্চলে সবসময় ছিলো একটা সোস্যাল ইভেন্ট, কালচারাল ইভেন্ট এবং রিলিজিয়াস ইভেন্ট। এটা কালেকটিভলি মানুষ এক্সপেরিয়েন্স করে। যে কারণে মহামারীকে কেন্দ্র করে অনেক রিচুয়াল সে সময়ে ছিলো। আপনারা অনেকে জানবেন যে গুটিবসন্তের জন্য নির্দিষ্ট পূজা হতো। শীতলা পূজা। আর কলেরার জন্য ছিলো ওলা বিবির কাছে প্রার্থনা, দোয়া। আমি যখন সেই নব্বই দশকে ডাক্তারি করেছি গ্রামে তখনও বহু মানুষ ওলাবিবিতে বিশ্বাসী দেখতে

~ www.amarboi.com ~

পেয়েছি। এটা খুব ইন্টারেস্টিং। এটা আরো গভীরভাবে বুঝবার ব্যাপার আছে। একজন হিন্দু দেবী আরেকজন মুসলমান বিবি। এগুলোরও নানা রকম ঐতিহাসিক ব্যাপার আছে। কিন্তু বিষয়টা ছিলো যে মহামারীকে মোকাবেলার প্রক্রিয়াটা ছিলো অনেক বেশি সামাজিক এবং ধর্মীয় একটা প্রক্রিয়া।

তো বলছিলাম যে তিনটা বড় বড় প্যান্ডেমিক হয়েছিলো অষ্টাদশ শতাব্দীতে। একটা ১৮১৭ সালের দিকে, আরেকটা ১৮৩২ এর দিকে, আরেকটা ১৮৫০—ওই দশকে। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যে, এই তিনটা প্যান্ডেমিকেরই সূত্রপাত হয়েছিলো বাংলা অঞ্চল থেকে এবং সেটা প্যারিস পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়। পুরো ইউরোপে শত শত মানুষ মারা গিয়েছিলো। সেটা বেঙ্গল কলেরা হিসেবে পরিচিত। এখন এই কলেরা ঔপনিবেশিক প্রশাসন এবং চিন্তাকে কয়েকভাবে আঘাত করে। আমার ব্যক্তিগতভাবে খুব আগ্রহের জায়গা হচ্ছে এই এপিডেমিকের হিস্ট্রি। ইনফ্যাক্ট এই বেঙ্গল কলেরার জীবাণু পুরো ইউরোপকে রুপান্তরিত করে দিয়েছে। আজকের যে আধুনিক ইউরোপ আমরা দেখছি তার পেছনে একটা বড় ভুমিকা আছে এই কলেরার। কয়েকভাবে এই মহামারী প্রচণ্ড বিপর্যস্ত করেছে তাদের। প্রশাসনিকভাবে, সামরিকভাবে এবং দার্শনিকভাবে। প্রথম কথা হচ্ছে যে, এটা এমন একটা রোগ যে, তখন এটা চিকিৎসা করার কোন উপায় ছিলো না। কলেরার কোন প্রতিষেধক বা নিরাময় ছিলো না। কলেরার চিকিৎসা জানা গেছে বহু পরে, পরের শতাব্দীতে এসে। কলেরা মহামারী হয়েছে কলোনিয়াল ইতিহাসের সবচেয়ে বুমিং টাইমে, নাইনটিন সেঞ্চুরিতে। এ সময়টা দে ওয়ার সেলিব্রেটিং দ্যা গ্রেটেস্ট সাকসেস অব কলোনিয়ানিয়াল রুল। প্রশাসনিকভাবে, বিজ্ঞানের দিক থেকে, দার্শনিকভাবে তারা তখন সারা পৃথিবীকে শাসন করছে। হঠাৎ করে কলেরার মতো এমন একটা অসুখ দেখা দিলো যার কোন চিকিৎসা জানা নাই। মেডিকেল সায়েন্সের নতুন নতুন আবিষ্কারের জয় জয়কার তখন, কিন্তু কলেরার কোন উত্তর তাদের জানা নাই। এটা মেডিকেল সায়েন্স নিয়ে তাদের যে গর্ব সেটাকে বিরাট ধাক্কা দেয়। অনেক মজার ব্যাপার আছে। একজন ডাচ ডাক্তার এই মুহূর্তে নামটা ভুলে গেছি, একটা মেশিন বানিয়েছিলেন তখন। কলেরা বাংলা থেকে যাত্রা শুরু করে যখন আমস্টার্ডামে আঘাত করে তখন নেদারল্যান্ডসের এক ডাক্তার একটা মেশিন বানিয়েছিলেন যিনি কলেরার রোগী এলে তাকে তার বানানো মেশিনটার ভেতরে ঢুকিয়ে দিতেন। ওনার একটা ধারণা ছিলো যে বডি থেকে অনেক ঘাম যদি বের করে ফেলা যায় তাহলে রোগী ভালো হবে। সরকার তাকে প্যাট্রোনাইজ করেছে, অনেক ইনভেস্ট করেছে কিন্তু আল্টিমেটলি কিছু করতে পারেন নাই তিনি। উনি খুব আত্মবিশ্বাসী ছিলেন তার চিকিৎসা নিয়ে। তারপরে যখন কিছুই হয় নাই, উনি ডাক্তারিই ছেড়ে দিয়ে কলেরা নিয়ে কবিতা লিখতে বসেন। সে কবিতার নাম হচ্ছে 'এনিমি উইদাউট অ্যা ফেস'। দেখতেই পাচ্ছেন কীভাবে কলেরা তাদের জাত্যাভিমানকে

~ www.amarboi.com ~

আঘাত করে। তাছাড়া ইউরোপ তখন বলছে যে, তারা মৃত্যুকে সুন্দর করে তুলেছে। এক ধরনের বিউটিফুল ডেথ সেলিব্রেট করছে তারা। হাসপাতালের সুন্দর বেডের ভেতরে মৃত্যু হবে মানুষের। সেইখানে এমন একটা অসুখ এলো তথাকথিত এক বর্বর দেশে থেকে যার মেনিফেস্টেশনও খুব বর্বর। লোকজন পায়খানা করতে করতে মারা যাচ্ছে। এ রোগের চেহারা সুরত ধরণ এতোটাই বর্বর যে এটা তাদের এসথেটিক্স অফ ডেথকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করেছে। এসব ইউরোপের বুর্জুয়া সেন্সিবিলিটিকে ভীষণভাবে আঘাত করে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এরা তখন এই রোগটাকেই কলোনিয়াল ন্যারেটিভকে পোক্ত করার কাজে ব্যবহার করে। তারা দেখায় যে, শুধুমাত্র এই ধরনের একটা বর্বর জাতি থেকেই এই ধরনের একটা অসুখ আসতে পারে। এটা কোন সভ্য-দেশে হবে না। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে, যখন কলেরা ফ্রান্সের বর্ডারে এসেছে তখন ফ্রান্সের যে হেড-সার্জন উনি একটা গেজেট প্রকাশ করেছিলেন। সে গেজেটের ভেতরে তিনি যা লেখেন আমি তা আমাদের পড়ে শোনাচ্ছি, 'টুডে নো ওয়ান কান্ট্রি অফ দ্যা গ্লোব হ্যাভ সিভিলাইজেশন, ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড কমার্স অ্যাচিভড হায়ার ডিগ্রি অফ পারফেকশন দ্যান দ্যাট অফ ফ্রান্স। এনলাইটমেন্ট হ্যাজ স্প্রেড সো ওয়াইডলি থ্রো অল ক্লাসেস অফ দ্যা সোসাইটি দ্যাট এভ্রিবডি ইজ ওয়েল অ্যাওয়ার অফ দি প্রিকশনস টু বি টেইকেন অ্যাগেইন্সট কজেজ অফ ডিজিজ, উই আর ব্লেসড উইথ এ সুপারব্ হেলথি পপুলেশন। হোয়াট কান্ট্রি মোরওভার ইজ রিচার দ্যান আওউরস ইন এনলাইটেন ফিজিশিয়ান্স।' তো উনি বলছেন যে, সব ইউরোপ কলেরায় সয়লাব হয়ে যেতে পারে কিন্তু ফরাসিদের যে সভ্যতা আছে, এই সভ্যতাকে আঘাত করা এই বর্বর অসুখের নাই। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই ঘোষণাটা আসার পরের সপ্তাহে রাজ-পরিবারেরর দুইজন কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। এইসব ব্যাপার যেটা বলছিলাম যে, তাদের বুর্জুয়া আভিজাত্যবোধকে ভীষণভাবে আঘাত করে।

আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এই, কলেরায় ব্রিটিশ আর্মির বহু সৈন্য মারা যায়। কলোনিয়াল প্রশাসন চালাতে রীতিমত একটা সেনাবাহিনী চালাতে হতো তাকে। আপনারা জানেন যে, ১৮৫৭ তে সিপাহি বিদ্রোহ হলো। সেই সিপাহি বিদ্রোহের প্রেক্ষিতের আগে ব্রিটিশ আর্মির যে কম্পোজিশন ছিলো, তাতে সৈন্যদের ভেতর সিক্সটি পার্সেন্ট ছিলো স্থানীয় ভারতীয়রা আর বাকিরা ইংরেজ। কিন্তু ঐ সিপাহি বিদ্রোহ হওয়ার কারণে তারা কম্পজিশনটা বদলে দেয় কারণ তারা তখন আর বিশ্বাস করতে পারছিলো না ভারতীয় সৈন্যদের। তারা অনেক বেশি ব্রিটিশ সৈন্য নিয়ে আসে। এই সময়ে খুব বড় একটা যুদ্ধ, ক্রিমিয়ার যুদ্ধ চলছিলো রাশিয়ার সাথে ব্রিটেনের। সেখানে বহু সৈন্য মারা যায়। সুতরাং সামরিকভাবেও কলেরা ব্রিটিশদের একেবারে কাবু করে দেয়। এই সব নানা কারণ মিলিয়ে ব্রিটিশরা অ্যালোপ্যাথিক মেডিসিনকে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের ভেতর নিয়ে আসার প্রতিজ্ঞা করে। এর আগে তারা সাধারণ মানুষ কি ধরনের স্বাস্থ্যসেবা পায়, তাদের

~ www.amarboi.com ~

আয়ুর্বেদ, ইউনানি চিকিৎসা এসব নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামায়নি। কিন্তু এই কলেরা বিশেষ করে, আর এর পাশাপাশি স্মল পক্স এবং পরবর্তীকালে প্লেগ তাদেরকে বাধ্য করে ভারতীয় সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবতে। কারণ, এসব রোগ তাদের মেডিকেল সায়েন্সটাকে আঘাত করেছে, তাদের বুর্জোয়া সেন্সিবিলিটিকে চ্যালেঞ্জ করেছে, ইকোনোমিকে চ্যালেঞ্জ করেছে এবং তাদের মিলিটারি ফোর্সকেও চ্যালেঞ্জ করেছে। তখন তারা ভাবতে থাকে যে, না, এখানে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে তো এভাবে চলতে দেয়া যায় না। তারপর ১৮৬০ সালে প্রথম গ্লোবাল হেলথ কনফারেন্স হয়। সেটাকে বলা হয়েছিলো স্যানিটারি কনফারেন্স এবং এই বিশ্ব কনফারেন্স হয়েছিলো কলেরাকে কেন্দ্র করে। ইউরোপের ডাক্তাররা বসেছিলো যে, এই কলেরা মহামারী নিয়ে কি করা যায়। বিশেষ করে ভারতবর্ষ তাদের কাছে চিন্তার বেশ বড় একটা কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এসময় অনেকগুলো পদক্ষেপ তারা নেয়া শুরু করে। আগে বলেছি, ঐতিহাসিকভাবে নানা ধরনের স্থানীয় চিকিৎসা ছিলো কলেরার আর স্মল পক্সে টিকাদার বলে একটা দল ছিলো যারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে স্মল পক্সের এক ধরনের সনাতন পদ্ধতিতে টিকা দিতো। সেটাও ছিলো অনেকটা ধর্মীয় রিচুয়ালের মতো। তারা, আগের বছরের বসন্তের যে গুটি হতো শরীর থেকে তার এক অংশ কেটে রেখে দিত এবং পরের বছর বসন্ত আসবার আগে মানুষের শরীরে ছুরি দিয়ে ছোট ক্ষত তৈরি করে লাগিয়ে দিতো। এর সাথে পূজা অর্চনা হতো। গঙ্গার পানি দেয়া হতো শীতলা দেবীকে খুশি করবার জন্য। কিন্তু এর মূল লজিক কিন্তু ভ্যাক্সিনেশনের লজিকের সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। রোগের জীবাণু কম-মাত্রায় শরীরে ঢুকিয়ে শরীরের ভেতর রোগ-প্রতিরোধ এ্যান্টিবডি তৈরি করা যাতে সে রোগ বিষয়ে একটা প্রতিরোধ-ক্ষমতা আগে থেকেই তৈরি হয়ে থাকে। এই প্রিন্সিপলটা আরো ডেভেলপ করে জেনার আধুনিক ভ্যাক্সিনেশন পদ্ধতি তৈরি করেন। তো ব্রিটিশরা এক পর্যায়ে আইন করে যে, ভারতে অ্যালোপেথি ছাড়া বাকি সব মেডিসিন আইনগতভাবে নিষিদ্ধ। আয়ুর্বেদ, ইউনানিসহ সব স্থানীয় চিকিৎসা-ব্যবস্থাকে তারা ক্রিমিনালাইজ করে ফেলে এই আইনের মাধ্যমে। এছাড়া এপিডেমিক অ্যাক্ট তৈরি করে।

যেহেতু তখনও জার্ম থিয়োরি তৈরি হয়নি, মহামারীর কারণ হিসেবে দুই ধরনের ধারণা তখন চালু ছিলো। একটা মায়াসমিক ধারণা আর আরেকটা কন্টেজিয়াস ধারণা। একটা প্রধান ধারণা ছিলো যে মানুষের আবর্জনা এবং নোংরা থেকে কলেরার জন্ম। আগেই বলেছি জীবাণুর ধারণা তখনও হয়নি। তারা কলেরার একটা বড় সোর্স হিসেবে মনে করে ভারতের যতোগুলো বড় বড় ধর্মীয় গ্যাদারিং হতো সেগুলোকে, সব তীর্থস্থানগুলোকে। কুম্ভমেলা, পুরি, কাশি, গয়া এসব জায়গা। তখন হজ্জ করার জন্য মুসলমানরা সবাই মুম্বাই, যাকে আগে বোম্বে বলা হতো সেখানে গিয়ে জড়ো হতো মক্কায় যাবার জাহাজে উঠবার জন্য। সেটাও একটা বড় রকম গ্যাদারিং ছিলো। এরকম যতো রিলিজিয়াস গ্যাদারিং

~ www.amarboi.com ~

ছিলো এগুলোর ওপরে তারা ট্যাক্স বসায় এপিডেমিক অ্যাক্ট-এর মাধ্যমে। এসব গ্যাদারিং বিষয়ে নানা কুৎসা প্রচার করে, সেগুলোকে ক্রিমিনালাইজ করা হয়। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে ঠিক একই সময়টাতে খ্রীষ্টান মিশনারিরা ব্যক্তিগতভাবে খ্রিস্টিনিয়াটি প্রচার করতো ভারতবর্ষে কিন্তু কলেরা মহামারীর পর ব্রিটিশরা তাদের আইনসিদ্ধভাবে খ্রিশ্চিনিয়াটি প্রচার করতে অনুমোদন দেয়। এই মহামারীকে তারা ধর্ম প্রচারের কাজে ব্যবহার করে। কলেরাকে তারা খ্রিস্ট-ধর্ম প্রচারের একটা বড় লজিক হিসেবে দেখায়। আরেকটা ছোট উদারহণ দিই। একজন মিশনারি ১৮২৮-এ বলছেন, 'প্রোব্যাবলি নো স্পট অন আর্থ রিপ্রেজেন্টস উইদিন সো স্মল অ্যা ক্যাম্পাস সাচ কমপ্লিকেটেড সিন অফ মিজারি, ক্রুয়েল্টি এন্ড ভাইস এজ রিপ্রেজেন্টেড টু ভিউ অ্যারাউন্ড দ্যা টেম্পল অফ জগন্নাথ ইন পুরি।' পুরি সম্পর্কে বলছেন যে, জগত সংসারে এর মতো নোংরা জায়গা আর নাই। সেই সাথে সে লেখায় তিনি এও বলছেন যে, ধর্ম এ ধরনের নোংরা পরিবেশের ভেতর চর্চা করা হয় তা কোনো সভ্যতার অংশ হতে পারে না। এর কারণেই খ্রিস্টান ধর্ম উন্নত একটা ধর্ম এবং সবার এ ধর্ম গ্রহণ করা উচিৎ। এভাবেই তারা ইউরোপের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। এভাবে ধর্ম প্রচারকারী এবং ঔপনিবেশিক শাসকরা মিলেমিশে কাজ শুরু করে।

১৮৫০-এর পর থেকে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে আরো নানা রকম পদক্ষেপ নিতে থাকে। প্রথম, তারা দেশের নানা প্রান্তে ডিসপেনসারি তৈরি করে। সারা ভারতের গ্রামাঞ্চলের মানুষের জন্য তারা ছোট ছোট ডিসপেনসারি বসায়। এগুলোর মাধ্যমে তারা সাধারণ মানুষের চিকিৎসা-সেবা দিতে শুরু করে। এর আগে শুধু তাদের আর্মি অফিসার এবং কলোনিয়াল অফিসারদের জন্য ছিলো চিকিৎসা-সেবা। এর দুটা উদ্দেশ্য। একটা হচ্ছে—গ্রামগুলো যেন কলেরাসহ অন্য মহমারীর সোর্স না হয়, মহামারীর লক্ষণ দেখা গেলে যেন ব্যবস্থা নেয়া যায়। দ্বিতীয়ত, গ্রামের মানুষ তো লেবার ফোর্স, তারা উপনিবেশিক অর্থনীতির চালিকা-শক্তি। তাদেরকে তো সুস্থ রাখতে হবে। তারপর তারা ঠিক করে যে এখানে মেডিকেল ট্রেনিং শুরু করতে হবে। প্রথম ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ শুরু হয় ১৮৫২ তে। এবং তারা ট্রেইন্ড ওয়েস্টার্ন মেডিসিন প্র্যাক্টিশনার তৈরি করে। পাশাপাশি ভারতবর্ষের অন্যান্য সনাতন চিকিৎসা-ব্যবস্থাকে বেআইনি ঘোষণা করে। মহামরীর সময় রীতিমত বলপ্রয়োগ করে রোগীদের হাসপাতালে আনা হতো সেপাই দিয়ে। মহামারীর সময় অনেক রিভোল্ট হয়েছে, জনগণ বিদ্রোহ করেছে কলেরা এবং প্লেগকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশদের নানা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। ব্রিটিশরা রোগীকে ইন্ডিভিজুয়াল হিসেবে সমাজ থেকে বলপূর্বক সরিয়ে নিয়ে কোয়েরেন্টাইন করেছে। কিন্তু যেটা বলছিলাম যে, মহামারী হচ্ছে এ অঞ্চলের মানুষের একটা কালেকটিভ এক্সপেরিয়েন্স, যৌথভাবে সেটাকে মোকাবেলা করতো তারা। রোগীকে কিছুতেই তারা হাসপাতালে দিতে চায় নাই। হাসপাতাল ঘেরাও হয়েছে, বিশাল বিদ্রোহ

~ www.amarboi.com ~

হয়েছে, হত্যাকান্ড হয়েছে। ১৮৯০-তে তারা একটা আইন পাশ করে যে, মহামারীতে পশ্চিমা চিকিৎসা-ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক। আপনারা লক্ষ করবেন কীভাবে ইউরোপিয় একটা জ্ঞানকাণ্ড, এক্ষেত্রে ধরেন, চিকিৎসা-বিজ্ঞান পৃথিবীর অন্য একটা অঞ্চলে প্রধান জ্ঞানকাণ্ড হয়ে উঠছে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই যে এ্যালোপ্যাথিক মেডিসন আজকে চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যের প্রধান ব্যবাস্থা হিসেবে জানছি, সেটা শুধুমাত্র তাদের চিকিৎসাবিদ্যার শক্তি দিয়ে হয়েছে তা ঠিক না। বায়োমেডিসিনের শক্তি নিশ্চয়ই সেখানে আছে, কিন্তু এর চর্চাকে সমাজে চালু করার পেছনে প্রশাসনিক, সামরিক, অর্থনৈতিক বলপ্রেয়োগ কাজ করেছে। অন্য স্থানীয় চিকিৎসা-পদ্ধতিকে নিয়ে চর্চা গবেষণার সুযোগ কমতে কমতে ক্রমশ সেগুলো আজ প্রান্তিক চিকিৎসা-পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে। তবে কিছু কিছু দেশ চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ডিকলোনালাইজেশনের একটা প্রক্রিয়া শুরু করেছে। পাক-ভারত উপমহাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের সময়ে এখানকার স্থানীয় চিকিৎসকরা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। রাজনীতিবিদরা তো আন্দোলন করেছেনই। গান্ধী, নেহেরু, জিন্নাহ এরা কাজ করছেন কিন্তু এর পাশপাশি খুব বিখ্যাত আয়ুর্বেদ চিকিৎসক, ইউনানি চিকিৎসক, বড় বড় হাকিম এই ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। হেকিম আজমল খান বলে একজন খুবই বিখ্যাত হেকিম ছিলেন যিনি ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে একটা বড় ভূমিকা পালন করেন। তার আন্দোলন ছিলো উপনিবেশিক শাসনের হাত থেকে স্থানীয় চিকিৎসা ঐতিহ্যকে রক্ষার আকাংখা থেকেই। পরবর্তীকালে ভারত সেই স্থানিক চিকিৎসাগুলোকে অনেক বেশি প্রধান-ধারা হিসেবে পরিণত করতে পেরেছে। বায়োমেডিসিনের সমান্তরালভাবে সেখানে আয়ুর্বেদ, ইউনানি চিকিৎসা গবেষণা চলে। ভারতে আমার পরিচিত একজনকে জানি যে একইসাথে মেডিকেল কলেজে চান্স পেয়েছে এবং আয়ুর্বেদিক কলেজে চান্স পেয়েছে এবং সে আয়ুর্বেদে পড়েছে, মেডিকেল কলেজে না গিয়ে। আমাদের দেশে অবশ্য বয়োমেডিসিনের দাপটের কাছে অন্য কোনো চিকিৎসা -চর্চা দাঁড়ায়নি।

এই কথার সূত্রে আগে যে বলছিলাম একটা ধারণার ডিসকার্সিভ আর ফিগারেটিভ রূপের কথা, সে প্রসঙ্গে আসি। এখন হাসপাতাল বলতে যে ধারণা আছে তার সাথে একটা বিশেষ ধরনের হাসপাতালের রূপই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে। কিন্তু আমরা কি অন্যরকম কোনো হাসপাতালের চেহারা ভাবতে পারি? আমি ভিয়েতনামে গিয়ে দেখেছি—সেখানে হাসপাতালের চেহারা আমাদের চেনা হাসাপাতালের মতো না। আমরা যেমন হাসপাতাল দেখতে অভ্যস্থ তেমন না। ওখানে মেডিসিনের একজন প্রফেসার এবং একজন ভেষজ-চিকিৎসক পাশাপশি চেম্বারে বসেন। হাসপাতালে যাওয়ার পর আপনাকে বেছে নিতে হবে আপনি কার কাছে যাবেন। ভেষজ চিকিৎসক না বায়োমেডিসিন। ভেষজ চিকিৎসায় সেখানে বিশাল গবেষণা হয়ে থাকে। প্রতিটা হাসপাতালের সাথে

~ www.amarboi.com ~

ভেষজ-উদ্ভিদের বাগান আছে, সেটা নিয়ে আলাদা গবেষণা হচ্ছে। আধুনিক মেডিসিনকে কীভাবে স্থানিক অভিজ্ঞতার সাথে মেলানো যায় ভিয়েতনামে তার উদাহরণ আমি দেখেছি। তারা বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে তাদের যে স্থানিক প্র্যাকটিসগুলো ছিলো সেগুলোকে আরো পরিশীলিত করার চেষ্টা করেছে। তো এভাবেই আমি বলছিলাম—আমরা বিকল্প একটা আধুনিকতার কথা ভাবতে পারি কিনা যেখানে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সাথে আমরা স্থানিক নানা অভিজ্ঞতা মিলিয়ে আধুনিকতার একটা নতুন চেহারা দেবো।

এবার সংক্ষেপে আমি আমার বর্তমান কাজের প্রেক্ষিতে আরেকটা উদাহরণ দিই। চিকিৎসা শাস্ত্রে একটা শাখা আছে প্যালিয়েটিভ কেয়ার বলে, বা বলা হয় এন্ড অফ লাইফ কেয়ার। বাংলায় বলা মুমুর্ষ রোগীর সেবা। কিছু রোগ আছে আমরা প্রতিরোধ করতে পারি, কিছু রোগ আমরা নিরাময় করতে পারি, কিন্তু মানুষের শরীর একটা সময় এমন একটা জায়গায় পৌঁছায় যেটাকে আমরা বলি টার্মিনাল স্টেজ। যে অবস্থা থেকে ফেরার আর উপায় নেই, মৃত্যু অবধারিত। যাকে বলা যায় মুমূর্ষু অবস্থা। এই সময়ের যে চিকিৎসা ও সেবা সেটাকে বলে প্যালিয়েটিভ কেয়ার। যখন আমরা মেডিক্যালি বুঝতে পারি যে, অবস্থাটা ইরিভার্সিবল। যেমন ক্যান্সার এডভান্সড স্টেজে যখন যায়, আবার অনেক রকম মেডিকেল কন্ডিশন আছে যেটাকে আর আরোগ্য করবার সুযোগ নাই, তখন কীভাবে তার মোকাবেলা করা হবে সেটা একটা বড় প্রশ্ন। মুমূর্ষু রোগীর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক নানা কষ্টকে উপশম করার পদ্ধতি হচ্ছে প্যালিয়াটিভ কেয়ার। এখন ইউরোপ এই মৃত্যুর সময়টাকে পুরোপুরি প্রাতিষ্ঠানিক করে ফেলেছে। সেটাকে 'হসপিস' বলে, হসপিটাল না 'হসপিস'। 'হসপিস' হচ্ছে শুধু মৃত্যু পথযাত্রী মানুষের জায়গা। রোগীর বাঁচার যখন আর কোনো সম্ভাবনা নাই তখন তাকে 'হসপিসে' নিয়ে যাওয়া হয়। হসপিটালেও 'হসপিস' অংশ আছে। এখন এই প্রক্রিয়ার সাথেও সেই আধুনিকতার ধারণার সম্পর্ক আছে। ইউরোপে 'গুড ডেথ' এর একটা সংজ্ঞা তৈরি হয়েছে। 'ভালো মৃত্যু' কোনটা? 'ভালো মৃত্যু' তাদের কাছে যে ইন্ডিপেন্ডেডলি অর্থাৎ কারো ওপরে নির্ভরশীল না হয়ে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক মেডিকেল সুপারভিশনে মৃত্যু-বরণ করবে। তার অটোনমি থাকবে। সে তার নিজের মতো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। তার নিজের ব্যাপারে সমস্ত তথ্যে তার অধিকার থাকবে। 'গুড ডেথ' বা ভালো মৃত্যুকে নিশ্চিত করার জন্য তারা মৃত্যুকে ইন্সটিটিউশনালাইজ করেছে অর্থাৎ এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করেছে যে হাসপাতালে ডাক্তার, নার্সসহ পেশাদারদের তত্বাবধায়নে যে মৃত্যু হবে সেটাই ভালো মৃত্যু। এখন সারা পৃথিবীতেই ক্রমশ ইনস্টিটিউশনাল বা হসপিটাল ডেথটাকেই একটা 'গুড ডেথ' এর সংজ্ঞায় পরিণত করা হয়েছে। আপনারা জানেন যে, আইসিইউ একটা বড় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশে। প্রায় সব বড় হাসপাতালে আইসিইউ আছে। এবং অনেক জেলা হাসপাতালে, হাসপাতাল

~ www.amarboi.com ~

নাই কিন্তু আইসিউ আছে। এমন একটা অবস্থা তৈরি করা হয়েছে যে, হাসপাতালে, আইসিউ-তে মৃত্যু না হলে আপনার 'ভালো মৃত্যু' হবে না। তাতে যেটা হচ্ছে যে, এক ধরনের নৈতিক খেলা শুরু হয়েছে। কোনো সুফল পাওয়া যাক বা না যাক, সামর্থ থাকুক আর না থাকুক পরিবার নৈতিকভাবে আইসিইউ-তে ভর্তি করাতে অনেক সময় বাধ্য হচ্ছে। মৃত্যু একটা ব্যবসার জায়গায় পরিণত হয়েছে। সেটা হচ্ছে, কারণ, আমি ধরে নিয়েছি যখন আপনার বাবা বা মা বা খুব কাছের মানুষ একটা টারমিনাল স্টেজে এসে পৌঁছেছে তখন আপনাকে হাসপাতাল থেকে বলা হচ্ছে যে, আপনি এই আইসিইউ-য়ের ভেতরে রাখলে উনি আরো পাঁচদিন বেঁচে থাকবেন। আপনি রাখবেন কি রাখবেন না? এটাতো একটা নৈতিক দ্বন্দ্ব। এখন আপনি একটা ছেলেকে যদি বলেন, আপনি আপনার বাবাকে কি সাতদিন আরো বাঁচিয়ে রাখতে চান? যদি না চান তাহলে আমি ভেন্টিলেটর খুলে ফেলবো। এটাতো একটা নৈতিক সিদ্ধান্ত। কঠিন নৈতিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু হয়তো সে মানুষটির জীবনের দিকে ফিরে আসার আর কোনো সম্ভাবনাও নাই তাহলে ঐ মেশিনপত্রের ভেতর তাকে আরো সাতদিন রাখার অর্থ কি? যে মানুষটা আইসিইউ-তে আছেন উনি এইভাবে বাঁচতে চান কি-না সেটাও প্রশ্ন-সাপেক্ষ। কিন্তু এই দ্বন্দ্বের ভেতরে পরে মানুষ নিঃস্ব হয়ে যায় আমাদের দেশে। যেটা আমি বলছি যে, গুড ডেথের একটা ইউনিভার্সাল সংজ্ঞা তৈরি করা হয়েছে ইউরোপিয়ান মডেলে। যেন এমন হাসপাতালে যন্ত্রপাতির ভেতরে থেকে মৃত্যুই হচ্ছে আধুনিক ভালো মৃত্যু।

কিন্তু এর বিকল্প ভাবনাও আছে। ভারতের কেরালার এক দল ডাক্তার এই 'গুড ডেথ' এর সংজ্ঞা-কে প্রত্যাখান করেছেন। তারা বলছেন যে, মৃত্যু মেডিকেলাইজড হওয়া উচিৎ না। মৃত্যু নিয়ে ব্যবসা করা চলবে না। তারা বলছেন—শুধু ডাক্তার, নার্স-রা মুমূর্ষু রোগীকে সেবা দেবেন সেটা ঠিক না। তারা বললেন—কমিউনিটির ভেতরে, বাসার ভেতরে রোগীকে রেখে সবাই মিলে দায়িত্ব নিয়ে একটা ভালো মৃত্যু নিশ্চিত করা যায়। তারা একটা ব্যবস্থা বের করেছেন যে, মুমূর্ষু রোগী বাসায় থাকবে এবং গ্রামের স্বেচ্ছাসেবীরা সেবা দেবে। ভলান্টিয়ারদের তারা প্যালিয়াটিভ কেয়ারের বেসিক কিছু ট্রেনিং দেন। প্যালিয়েটিভ কেয়ারের জন্য রকেট সায়েন্স লাগে না। চিকিৎসা-শাস্ত্রের মৌলিক কিছু জিনিস জানলেই হয়। তারা মৃত্যুকে ডিমেডিকেলাইজড এবং ডিইনস্টিটিউশনালাইজড করছেন। মুমূর্ষু রোগীরা সেখানে বাড়িতেই থাকেন এবং বাড়িতে রেখে এক ধরনের পদ্ধতি উনি তৈরি করেছেন যা দিয়ে নিশ্চিত করেন একটা 'ভালো মৃত্যু'। কিন্তু এই ভালো মৃত্যুর সংজ্ঞা ইউরোপীয় ভালো মৃত্যুর সংজ্ঞা থেকে ভিন্ন। মানে ইউরোপের একজন মানুষের কাছে সবচেয়ে সুন্দর মৃত্যু কি হবে—সবচেয়ে সুন্দর মৃত্যু হচ্ছে, আমি যেন কারো ওপর নির্ভর না করি, ব্যথা-মুক্ত মৃত্যু পাই আমি—যেন এমন একটা মৃত্যু পাই যেখানে আমি আমার

~ www.amarboi.com ~

মতো সিদ্ধান্ত নিতে পারবো। কিন্তু আমাদের দেশের মানুষের কাছে ভালো মৃত্যুর সংজ্ঞা হয়তো সম্পূর্ন ভিন্ন। হয়তো তার কাছের মানুষদের ঘিরে রেখে মৃত্যু হওয়াটাই হচ্ছে ভালো মৃত্যুর প্রধান শর্ত। গবেষণার সূত্রে অনেক ব্রিটিশ লোককে জিজ্ঞেস করেছি, মুমূর্ষু অবস্থায় আপনার সবচেয়ে দুশ্চিন্তার বিষয় কি? তাদের সবার কথাটা হচ্ছে—আমি কারো ওপর নির্ভর করতে চাই না। সবচেয়ে ভয় হচ্ছে—আমাকে কারো ওপরে নির্ভর করতে হবে। আমার ছেলের ওপর হয়তো নির্ভর করতে হবে, আমার মেয়ের ওপর হয়তো নির্ভর করতে হবে। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ভয়। তো, আমি স্মরণ করছিলাম যে আমার বাবা যখন মারা যান, আমার বাবার একদম শেষ সময়গুলোতে আমি ছিলাম তার কাছে। প্রস্রাব পায়খানা বিছানায়ই করতেন। পরিষ্কার করতে হতো। মনে আছে যে, আমি একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, এই যে তোমার এই অবস্থায় তোমাকে পরিষ্কার করছি তোমার কি অস্বস্তি লাগছে, খারাপ লাগছে? এখনও মনে আছে যে, আমার বাবা আমাকে বলেছেন যে, 'মোটেও না। আমি তো তোমাকে একটা সুযোগ দিলাম আমাকে সেবা করার। এটা তোমার একটা অপরচুনিটি।' এখন এটা হচ্ছে মুমূর্ষু অবস্থার একটা ভিন্ন এটিচুড। এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে কেরালার ডাক্তাররা, ডা. সুরেশ কুমার যাদের ভেতর অন্যতম একজন, তারা প্যালিয়াটিভ কেয়ারের ভিন্ন একটা মডেল তৈরি করেছেন।

আবার সেই ফ্রেম-ওয়ার্কের ধারণায় আসি। সুরেশ কুমার প্রমুখরা প্যালিয়েটিভ কেয়ারের বিজ্ঞানসম্মত ধারণাগুলো নিয়েছেন এবং একে যদি আমি হিস্ট্রি-টু-এর সাথে যুক্ত করি তাহলে দেখবো যে, তারা স্থানিক সংস্কৃতিতে মুমূর্ষু রোগীর সেবার যে ঐতিহ্য আছে তাকে আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে যুক্ত করে প্যালিয়াটিভ কেয়ারের একটা বিকল্প মডেল তৈরি করেছেন। মৃত্যুর সাথে মোকাবেলার একটা স্থানীয় রূপ তৈরি করেছেন। আমরা বলতে পারি—প্যালিয়াটিভ কেয়ারকে উনি ডিকলোনাইজড করেছেন। এখন সেটা শুধু কেরালার না, পুরো ভারতের খুব বড় একটা প্রোজেক্ট। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একে একটা মডেল প্রোজেক্ট হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে আমি নিজে এ মডেলটার ওপর একটা কেইস স্টাডি করেছি। অনেকবার গিয়েছি কেরালায়।

আমি যদি আলোচনার সারাংশ করি তাহলে যা বলতে চেয়েছি তা হলো—এই যে, ইউরোপ একটা ভূখণ্ড না, এটা একটা বিশেষ চিন্তা প্রক্রিয়া এবং সে চিন্তা প্রক্রিয়াটা বিশেষ ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে সারা পৃথিবীর চিন্তা প্রক্রিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। চিন্তার এই পাশ্চাত্য আধিপত্যের প্রক্রিয়া তৈরি হবার পেছনে অন্য অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতাটা কাজ করেছে। এখন এই অজ্ঞতাকে পুঁজি করে যে সমাজ, যে আধুনিকতা আমরা তৈরি করেছি সেটাই চূড়ান্ত আধুনিকতা কী-না সে প্রশ্ন করার সুযোগ আছে। ভিন্ন আধুনিকতা, ভিন্ন পথ সৃষ্টির সুযোগ আছে। সেই সুযোগগুলো আমরা কীভাবে তৈরি করবো সেটা

~ www.amarboi.com ~

আমাদের ভাবতে হবে। এ শুধু তাত্ত্বিক আলোচনার জায়গা থেকে আমি বলছি না, চিকিৎসা-বিজ্ঞান থেকে আমি উদাহরণ দিলাম যে, ভিন্ন আধুনিকতা সম্ভব। আবারও সেই কথাটি বলি যে আইডিয়ার ডিসকার্সিভ এন্ড ফিগারেটিভ রূপ আছে। যেমন ধরা যাক গুডডেথের একটা ডিসকার্সিভ সংজ্ঞা, একটা বয়ান আছে। তো গুড ডেথ ডিসকোর্সের একটা চেহারা হচ্ছে, এই আইসিইউ-তে, হাসপিটালে, হসপিসে মৃত্যুর ব্যবস্থা করা আর আরেকটা চেহারা হচ্ছে, কেরালার সেই মডেলে ঘরের ভেতরে মৃত্যুর ব্যবস্থা করা। এখন আমি কোন বয়ানটাকে নেবো এবং সেই বয়ানের জন্য কোন পদ্ধতিটা আমি জানবো? আলোচনাটা চিকিৎসার ক্ষেত্রে হলেও আমি শেষ করতে চাই এ কথাটা বলে যে, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সবক্ষেত্রেই এই ভাবনা, এই প্রশ্নগুলো প্রযোজ্য। আমরা সবাই প্রায়ই যেন নিজেদের সেই ওয়েটিং রুম অফ হিস্ট্রি-র অধিবাসী ভেবে বসে থাকি। আমরা এক ধরনের হীনমন্যতা নিয়ে বসে থাকি যে, কবে আমরা আধুনিকতার ঐ ইউনিভার্সেল মডেলটা তৈরি করতে পারবো। আমি মনে করি যে, বিকল্প মডেল তৈরির সুযোগ আছে এবং সেটা অনেক চিন্তা, চর্চা ও নিষ্ঠার ব্যাপার। তার প্রস্তুতি আমাদের আছে কি-না সেটা নিয়ে আমাদের নিজেদেরও আত্মসমালোচনা করতে হবে, ভাবতে হবে। সেইসব কাজের প্রথম সূত্রপাত হচ্ছে চিন্তাগুলোকে নিয়ে আলাপ করা। সবাই মিলে যখন চিন্তা করা হবে তখন সে চিন্তার পথও অনেক খুলবে।

বোধিচিত্তকে আবারো এই ধরনের একটা আসরের ব্যবস্থা করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। যে কোনো জায়গা থেকেই, একটা বিশেষ স্বার্থের বাইরে থেকে উন্মুক্তভাবে যত ভাবতে পারবো ততোই আমাদের জন্য মঙ্গল। এতোক্ষণ ধরে যে আপনারা আমার কথা শুনলেন সেজন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

আমার বই

~ www.amarboi.com ~

জিজ্ঞাসা পর্ব

প্রশ্নকারী ১ : আমার প্রশ্নটা হচ্ছে লোকাল মডার্নিটির বিষয়ে—এই যে, মডার্নিটি প্লুরাল হবে, মডার্নিটির অনেকগুলো ভার্সন থাকতে পারে, দীপেশ চক্রবর্তী যেমন করে বলছেন। এখন যদি দুধ-চায়ের উদাহরণ দেখি—চা মর্ডানাইজ হবার একটা উপাদান, এটার সাথে দুধ মিশিয়ে দিলে এখানকার মানুষ খায়। কিন্তু দুধ-চা যদি লোকাল মডার্নিটি হয়, দুধ-চা খাইলে তো গ্যাস হয়। আমি কোন পয়েন্টে এবং কোন উপাদান সিন্থেসাইজ করবো এবং কোন উপাদান সিন্থেসাইজড করবো না সেটার বাছাই করার মেথোডোলজি কি হবে। এবং এই দিক থেকে সৈয়দ নিজার আলম ওনার যে বি-উপনিবেশায়ন প্রস্তাব তাতে সেই বি-উপনিবেশায়নের উদাহরণ তিনি দিয়েছেন। আমি অস্বীকার করবো না যে, পুরনো দই, দুধ, এটা মিলিয়েই তো আমার নতুন দইটা এসে দাঁড়াবে। সেই দিক থেকে আমি কোনটার সাথে কোনটা মেশাবো, কোনটার সাথে কোনটা মেশানো যাবে না, গ্যাস্ট্রিক হয়ে যেতে পারে, সেটার উত্তরটা কি হবে?

প্রশ্নকারী ২ : আমরা ইতিহাসের বিশ্রামাগারে অপেক্ষা করছি এবং এই ডিসকোর্সটা দাড় করানো হয়েছে মূলত অ-ইউরোপীয় অঞ্চলগুলোর কি নেই সেটার ওপর ভিত্তি করে বুঝতে পারলাম। ... এখন কথা হচ্ছে যে, আমাদের কি আছে সেটাকে ডিফাইন করা জরুরি। কেন জরুরি কারণ সময় জট পাকিয়ে থাকে, ভবিষ্যতের যে প্লুরালিটি, ভবিষ্যতের যে বহুত্ব, এই বহুত্বের ভেতরে কি স্থান পাবে আর কি স্থান পাবে না সেটা আমাদের জানা দরকার যদি আমার কি আছে সেটাকে ডিফাইন করতে পারি। এখানে ফোর্ড গাড়িকে গঙ্গা-জল দিয়ে ধোয়ার উদাহরণ এসেছে... তো এই ভবিষ্যতের প্লুরালিটির মধ্যে কি আমরা ফ্লোরিডা থেকে যখন রকেট উৎক্ষেপণ করছি তখন সেই রকেটটা গঙ্গা-জলে ধুয়ে উৎক্ষেপণ করা হচ্ছে কী-না সেটা দেখাবো? সেটা হাস্যকর হতে পারে কিন্তু প্রশ্নের উত্তরের জন্য জরুরি। ... আর মানবতা বা মানবতাবোধ এই ধারণাগুলোর সমগোত্রীয় যে ধারণাগুলো আছে সে ধারণাগুলো আমার মতে, যতোটা না আইডেন্টির সাথে জড়িত, এই যে হ্যাট এবং লুঙ্গির যে উদাহরণটা এসেছে, আমার কাছে বরং সেটা আরো বেশি রাইট টু সারভাইভ-এর প্রশ্ন জড়িত।

~ www.amarboi.com ~

সারভাইভালের ধারণার সাথে সম্পর্কিত। আজকে শোষণ, ত্রাস আর লুণ্ঠন এমন একটা পর্যায় এসে পৌঁছেছে এবং সংকটটা এমন জায়গায় গিয়েছে যে, মানবতার ধারণাগুলো সরাসরি সংকটের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাচ্ছে। আজকে রোহিঙ্গা শিশু যেমন তার মাকে রেপ হতে দেখছে, তার বোনকে সেনাবাহিনীর ছুড়ির নিচে দেখছে, এবং লুঙ্গি-পরা অবস্থায় সে পালিয়ে কক্সবাজারে এসে আশ্রয় নিচ্ছে। আবার একটা ইয়েমেনের শিশুও আকাশ থেকে সৌদী আরবের এবং সৌদী-ইউএসএর গুচ্ছ-বোমা থেকে বাঁচার জন্য জোব্বা নিয়ে কোথাও আশ্রয় নিচ্ছে। এখানে লুঙ্গি এবং জোব্বা, এই যে দুটা আইডেন্টিটি এক জায়গায় এসে মিশে যাচ্ছে, কারণ, এখানে মানবজাতি সংকটের সম্মুখীন। রাইট টু সারভাইভ। আমি এটাকে ইউনিভার্সাল বলতে চাই যে, বিশ্ব যতো সংকটের মুখোমুখি হবে ততো এই ধারণাগুলো আইডেন্টিটি-র ধারণা থেকে ইউনিভার্সাল ধারণা হয়ে যাবে, ইন টার্মস অফ সারভাইভাল। ক্লিয়ার করলে ভালো হয়।

শাহাদুজ্জামান : ধন্যবাদ। কথা হচ্ছে যে, কোন ইউনিভার্সাল ধারণার রোড ম্যাপ খুব সহজ। আমরা যদি ধরে নিই যে মানবাধিকার বলতে, গণতন্ত্র বলতে কিংবা উন্নয়ন বলতে আমি ঠিক এইটাই বোঝাই, আমার যদি একটা ইউনিভার্সাল ডেফিনেশন থাকে তাহলে আমার পথটা ধরে এগোনোর একটা রোড-ম্যাপ থাকে যে, কীভাবে আমরা ওইদিকে যেতে পারি। যখনই আমরা প্লুরাল ফিউচারের কথা বলি, ভবিষ্যতের বহুত্বের কথা বলি, তখন বিষয়টা আনসার্টেইন হয়ে যায়, রিস্কি হয়ে যায়, এবং সেটার খুব ক্লিয়ার রোড-ম্যাপ নাই। সে কারণেই এটা খুব চ্যালেঞ্জিং এবং এই যে দীপেশের ওয়েটিং রুম অফ হিস্ট্রি বা প্লুরাল মডার্নিটির ধারণা তার সাথে সংশ্লিষ্ট যারা এই কথাটা বলছেন তাদের একটা বড় চ্যালেঞ্জের জায়গা হচ্ছে যে, তারা তাদের স্পষ্ট রোড-ম্যাপ দিতে পারছেন না। যেমন, মার্ক্সিস্ট ধারণার একটা ক্লিয়ার রোড-ম্যাপ আছে। তার ভিশনটা খুব ক্লিয়ার। কিন্তু আমরা এই প্লুরাল মর্ডানিটি নিয়ে কথা বলছি খুব বেশিদিনের কথা না। কিন্তু তার ক্লিয়ার রোড ম্যাপ এখনও তৈরি হয় নাই। তো সেই জায়গা থেকে যদি বলেন , প্রথম কথা হচ্ছে যে-কোনটার সাথে কোনটা মিলালে প্লুরাল মডার্নিটি হবে এটার সোজা কোনো উত্তর নাই। যেমন করে অন্যান্য থিয়োরিটিক্যাল জায়গা থেকে বলা হয় প্রাকসিস রিলেটেড যেসব পলিটিকাল ইকোনমিকাল থট, মার্ক্সিস্ট জায়গা থেকে যদি বলি, তাদের এক ধরনের স্পষ্ট গন্তব্য আছে যে কোথায় যেতে হবে এবং কি করতে হবে। কিন্তু প্লুরাল বা অল্টারনেটিভ মাডর্নিটির তো একটা নির্দিষ্ট গন্তব্য নাই। আগে ভাবনার জায়গা থেকে আমাদেরকে স্পষ্ট হতে হবে যে, আমরা কি বিকল্পভাবে ভাবতে পারি কি-না? তারপরে রোড-ম্যাপটা তৈরি করার জন্য কাজ করতে হবে। সেজন্য আমি একটু আগে বলছিলাম যে হিস্ট্রি-টু-তে খেয়াল করতে হবে। আপনারা সিন্থেসিসের কথা বলছেন যে, কোথায় সিন্থেসিসটা

~ www.amarboi.com ~

হবে। কোথায় আমরা এই সমন্বয়টা তৈরি করবো। এই জায়গাটাতে আবারও বলছি যে, অতীতে তাকাতে হবে। অতীত নিয়ে ভাবা মানে, উনি বললেন যে, এখন কি আমরা স্যাটেলাইট গঙ্গা-জল দিয়ে বা জমজমের পানি দিয়ে ধুয়ে দেবো কি-না? একজন দুধ-চায়ের কথা বললেন। বাই দ্য ওয়ে দুধ-চা লোকাল ব্যাপার না, যেটা আপনি বলছিলেন। ব্রিটিশ লোকেরা দুধ-চা খায়, বরং বলতে পারেন—রং-চা আমাদের লোকাল প্রডাক্ট। যাহোক, সিন্থেসিসের প্রশ্নটা জরুরি। কথা হচ্ছে, অতীতচারিতা এবং অতীত-মুখিনতার পার্থক্য আছে। আমি ওই উদাহরণটা দেয়ার মানে এই না যে, আমি অতীত-মুখিনতার কথা বলছি। বলতে চাচ্ছি যে, অতীতের ভেতরে এমন কিছু চিহ্ন আছে যা আমাদের ভবিষ্যতের নিশানা দেয়। এটা হিস্ট্রি-টু-এর মামলা। আপনি নিজারের কাজের উদাহরণ দিলেন। সুলতানের ওপর নিজারের কাজটা খুব চমৎকার একটা কাজ যেখানে উনি এই ইস্যুটা নিয়েই কথা বলেছেন, কি করে পেইন্টিং-এর গ্লোবাল যে ট্রাডিশন আছে, সেখানে আমাদের পট, পটের রেখা সেগুলোকে আমরা কীভাবে সিন্থেসাইজ করে এই গ্লোবাল পেইন্টিং-এর দিকে নিতে পারি। সুলতান সে কাজটা করার চেষ্টা করেছেন। এই ধরনের চেষ্টাগুলো তো আমরা বিশেষ করিনি। গ্লোবালি এই কাজগুলো খুব কম হয়েছে। হিস্ট্রি-টু-এর দিকে খুব কম নজর দেয়া হয়েছে। এটা কঠিন প্রশ্ন যে, কীভাবে আমরা এই সিন্থেসাইজটা করবো। সেই সিন্থেসাইজ করার আগে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে, অতীতের ভেতর সেই নিশানা খুঁজে দেখা। আমি কি আমার স্থানটাকে ভালোভাবে চিনি? আমাদের যে সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলন হয়েছে তাতে আমরা যতোটা না বেশি চর্চা করেছি অন্যদেশের ইতিহাস, ভূগোল, আমার দেশের স্থানিকতা নিয়ে খুব কম সময় ব্যয় করা হয়েছে। আপনি যদি জানতে চান ঠিক কোথায় আমরা সিন্থেসিজটা করবো সেটার উত্তর দেয়ার আগে আমার কথা হবে যে আমরা সবাই মিলে আমাদের স্থানটাকে যেন আরো ভালোভাবে বুঝতে পারি। বোঝার চেষ্টা করি এবং সেখান থেকে খুঁজে বের করি যে, আমাদের ইতিহাসে কি কি উপাদান আছে যা বিকল্প আধুনিকতার ইশারা দেয়। সে কাজ কিন্তু হয়নি। রাজনৈতিকভাবেই হয়নি। বাম রাজনীতির ভেতরে যতোরকম চর্চা হয়েছে তাতে এই মাটি, দেশ, সংস্কৃতিকে ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা খুব কম করা হয়েছে। তো, দইয়ের সাথে দুধ, চায়ের সাথে দই হবে কি-না, দই আছে কি-না, চা আছে কি-না দুধ আছে সেটার উত্তর এ মুহূর্তে তো হাতে নাই আমাদের। কথাটা হচ্ছে আমরা এটা বিশ্বাস করি কী-না যে, চা-টা অন্যরকম হতে পারে। তারপরে আমাদের নজরটা দিতে হবে আমাদের স্থানিক ইতিহাসের দিকে। আমাদের স্থানিক অভিজ্ঞতার দিকে। দীপেশ একে বলেছেন পলিটিক্স অব বিলংগিং। আপনি বলছিলেন যে, পৃথিবীর অবস্থা এমন হয়েছে যে, সারভাইবালের প্রশ্নে রাইটের ইউনিভার্সাল ডেফিনিশনের দরকার

~ www.amarboi.com ~

পড়ছে। আপাতভাবে থাকাটা ঠিক। কিন্তু আবার এখানেও প্রশ্ন আছে। এগুলো আরো জটিল এবং অমীমাংসিত প্রশ্ন। আমি মনে করি যে, রাইটেরও প্লুরালিটি হতে পারে। সেদিন বলিভিয়ার প্রেসিডেন্টের টিভি ইন্টারভিউ দেখছিলাম। উনি বলছেন যে, শিশুশ্রম আন্তর্জার্তিক ভাবে নিষেধ ঠিক আছে। এটা মানবাধিকার লঙ্ঘন। উনি এটা মানছেন না। উনি বলছেন যে, আমাদের এখানে অল্প বয়সে বাবার সাথে সবাই মাঠে কাজ করে। তাতে কোনো সমস্যা তিনি দেখেন না। তিনি বলেন—আমি যেটা নিশ্চিত করতে চাই যে, স্কুলে যেতে হবে শিশুদের এবং তারপর যদি সময় পাওয়া যায় তাহলে সে তার বাবার ক্ষেতে, খামারে বা অন্য কোথাও যদি সুযোগ পাওয়া যায় কাজ করবে। বারো বছরের নিচে হলে যে, সে কাজ করতে পারবে না এই নিয়ম আমি মানি না। রুয়ান্ডার প্রাইম মিনিস্টারকে ইউরোপীয়ানরা অটোক্রেট বলে। বলে তার দেশে মানবাধিকার নাই। উনিও সেদিনের একটা ইন্টারভিউ-তে বলছেন দেখলাম যে, আমাদের দেশে হুট টুটসি গণহত্যার সময় যখন প্রতিদিন ১০ হাজার লোক মারা যাচ্ছে তখন ইউরোপীয়ান দেশগুলো মিলে, ইউএন মিলে তর্ক-বিতর্ক করেছে একে আদৌ জেনোসাইড বলা যাবে কিনা। কোনো রকম কোনো সাহায্য তারা করেনি। রুয়ান্ডার মানুষরাই এবং কিগামি তার নেতৃত্বে থেকে সে গণহত্যা থামিয়েছেন। এখন রুয়ান্ডা নানা দিক থেকে আফ্রিকার সবচেয়ে অগ্রগামী দেশ। কিগামে বলছেন ইউরোপের কোনো অধিকার নাই তাকে মানবাধিকারের জ্ঞান দেয়ার। কথা হচ্ছে অধিকারের ধারণাও স্থান নির্দিষ্ট হতে পারে। ভুটান একটা ছোট্ট দেশ। এখন সে বলছে যে, আমি পশ্চিমা দেশের দেয়া ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিকেটর মানি না। সারা পৃথিবীতে যে ইউনিভার্সাল ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিকেটর তৈরি করা হয়েছে তারা সেটার বিপরীতে নতুন ইন্ডিকেটর তৈরি করেছে। হ্যাপিনেস ইন্ডিকেটর। একটা ছোট্ট দেশ কিন্তু তারা চ্যালেঞ্জ করতে পেরেছে। তাহলে ইউনিভার্সাল যে রাইটের কথা বলছি, ইউনিভার্সাল যে ডেভেলপমেন্টের কথা বলছি সেটা তো সব সময় ঠিক না। আমি আমার স্থানিক অভিজ্ঞতার ভেতরে কি বিকল্প কোন প্রপঞ্চ তৈরি করতে পারি কী-না সেটা ভাবতে হবে। আমি যদি সামারাইজ করি। অতীতের দিকে তাকানো মানে অতীতচারিতা না, অতীতে চলে যাওয়া না, অতীত হচ্ছে আমাদের এমন একটা রিসোর্স যেখানে যে-কোনো একটা ভূখণ্ডের কথা যদি আপনারা ভাবেন, সে ভূখণ্ডের হাজার বছর ধরে কিছু মানুষ এখানে রয়ে গেছে এবং তাদের জীবন-যাপনের অভিজ্ঞতার নানা রকম চিহ্ন তারা সেখানে ফেলে গেছে। এই ভূমিতে যদি আমরা কিছু করতে চাই তাহলে সে চিহ্নের দিকে আমাদের তাকাতে হবে। আমি যখন বাংলার বাগধারাগুলোর দিকে তাকাই, দেখবেন অসাধারণ সমস্ত কথা। বহু বছরের অভিজ্ঞতার নির্যাস সেখানে আছে। সেগুলোকে উন্মোচনের ব্যাপার আছে। এই যে বলা হচ্ছে গরু মেরে জুতা দান, এতে জীবন অভিজ্ঞতা

~ www.amarboi.com ~

ধারণ করা আছে। স্থানিক এই অভিজ্ঞতাগুলোকে আমাদের খুঁজে দেখতে হবে। আমরা সেই কাজগুলো করতে পেরেছি কি? আমরা তো করতে পারিনি। আমার কথাটা হচ্ছে, অতীতের ভেতরে আমাদের সম্পদ আছে যেটা আমাদের ভবিষ্যতের পথটাকে খুঁজে নিতে সাহায্য করবে। স্থানিক অভিজ্ঞতাকে ভালোভাবে বুঝলেই আমরা খুঁজতে পারবো কোথায় কি সিনথেসাইজ করতে হবে।

প্রশ্নকারী ৩ : একটা স্টেটমেন্ট ছিলো এরকম যে, বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ইন্ডেজেনাস মেডিকেল সিস্টেম আছে এবং এগুলো প্রাকটিস হচ্ছে। এগুলো সম্পর্কে ডাব্লিউ.এইচ.ও বলছে যে, এই মেডিকেল সিস্টেমগুলো ভালো, কিন্তু বাজেভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এবং তারা বলছে যে, এটাকে ওয়েস্টার্ন মেডিসিনের সাথে ব্যবহার করা যায়, কারণ, বিভিন্ন অঞ্চলে যখন আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন বাধা তৈরি হচ্ছে এই জায়গা থেকে। তো এখন, ডাব্লিউ.এইচ.ও.র এই স্টেটমেন্টটা কি এজন্যেই যে, ওয়েস্টার্ন মেডিসিন নিয়ে যে বিভিন্ন ধরনের ক্রিটিক বর্তমানে আছে বিশেষ করে উত্তর-উপনিবেশিক সময় থেকে এটা চলমান আছে, সেই ক্রিটিকের প্রেক্ষিতে একটা নিরপেক্ষ অবস্থান তৈরির চেষ্টা? না আসলেই তাদের একটা সদিচ্ছা আছে। যেহেতু আপনি গ্লোবাল হেলথ পড়ান তো সেক্ষেত্রে আপনার মতামত কি?

শাহাদুজ্জামান : ঔপনিবেশিক সময় থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছি ঠিকই কিন্তু সেই ঔপনিবেশিক চিন্তার ফ্রেমওয়ার্ক কিন্তু চলমান আছে, নানারকমভাবে। রিমোটোলি আমরা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছি। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার যে কথাটা বললেন সেটার নানা কারণ আছে। গ্লোবাল হেলথ নিয়ে আমি আফ্রিকায় কাজ করেছি, এশিয়ায় কাজ করেছি বাংলাদেশে তো করেইছি। গ্লোবাল হেলথের নতুন কোনো ধারণা, ধরা যাক রোগ-প্রতিরোধ বা রোগ-নিয়ন্ত্রণের কোনো মডেল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ওয়েষ্টার্ন মডেল যখন নতুন কোন দেশে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তা প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। কোনো কিছুই সাস্টেইন করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা ঐ স্থানের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়, মানুষ যদি কালচারালি এক্সেপ্ট না করে তা যত বড় প্রজেক্টেই হোক না কেন তাতে কাজ হবে না। ডাব্লিউ.এইচ.ও একটা হেলথ প্রোগ্রামকে স্থানীয়ভাবে এক্সেপটেবল করবার জন্য, কালচারালি সেনসিটিভ করার জন্য তার লোকাল ট্রেডিশনের সাথে তাকে মেলাতে বলে, ট্রাডিশনাল মেডিসিনকে ইনকরপোরেট করতে বলে, যদিও শেষ সমাধানটা হয়তো তারা করতে চায় ওয়েষ্টার্ন মেডিসিন দিয়েই। সেখানে একটা হায়ারার্কি থাকেই। দেশজ চিকিৎসা-প্রথাকে ডাব্লিউ.এইচ.ও প্রমোট করতে চায় সেটা ঠিক কিন্তু বায়োমেডিসিনের দাপট এতো যে, সেটা সহজ ব্যাপার না। কিছু কিছু দেশ যেমন আমি বলছিলাম যে, ভিয়েতনাম, ইন্ডিয়া কিন্তু বেশ ভালোভাবেই ট্রাডিশনাল মেডিসিন আর মডার্ন মেডিসিনকে মেলাতে পেরেছে তাদের হেলথ সিস্টেমে। আমাদের ওয়েষ্টার্ন

~ www.amarboi.com ~

মেডিসিনের অর্জনগুলো যেমন গ্রহণ করতে হবে, ক্রিটিক্যালিও দেখতে হবে। আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে দুইটা উদাহরণ দিই। হাসপাতালে মেয়েদের ডেলিভারির একটা পজিশন আছে লিথোটোমি পজিশন। মেডিকেল সাইন্সে এটাই পড়ানো হয় আমরা মেডিকেল কলেজে এভাবেই ডেলিভারি করিয়েছি। মেয়েটি শুয়ে থাকবে এবং বাচ্চা হবে। কিন্তু উত্তরবঙ্গে আমি যখন প্রথম গ্রামে কাজ করতে যাই, আমি দেখতাম সেখানে সব মেয়ের বাচ্চা হয় বসা অবস্থায়। বসে বাচ্চা হয়। ডাক্তার হিসেবে এটা আমার জন্য নতুন অভিজ্ঞতা। তারপরে যখন আমি এর ওপর পড়াশোনা করলাম, জানলাম যে, আসলে বসা পজিশন ডেলিভারির জন্য অনেক ভালো। বসে ডেলিভারি হলে মধ্যাকর্ষণের সহায়তা পাওয়া যায়। যার প্রসব হচ্ছে তার দিকে থেকে এটা অনেক সুবিধা, কিন্তু শোয়া পজিশন হলে ডাক্তারের জন্য সুবিধা। এটাকে ফুকোর ভাষায় বলা যায় মেডিকেল গেইজ। এর সাথে ডেলিভারিকে মেডিকেলাইজেশনের ব্যাপার আছে। মেয়েকে লিথোটোমি পজিশনে রাখলে টোটাল ব্যাপারটা ডাক্তারের নিয়ন্ত্রণে থাকে। এখন ইউরোপের নানা দেশেও বহু বিকল্প ডেলিভারি হচ্ছে, ওয়াটার ডেলিভারি ইত্যাদি। তো থিউরেটিক্যালি এর কাউন্টার আর্গুমেন্ট তৈরি করতে হলে তো এ নিয়ে জ্ঞানতাত্ত্বিক কাজ করতে হবে। বিকল্প আইডিয়াগুলো জেনারেট করার আমাদের নলেজ টুলসটা অনেক সময় নাই, আমাদের ইচ্ছাটা নাই, রিসোর্স নাই। কথা হচ্ছে বিকল্প ভাবনাগুলো ভাবতে হবে। সিন্থেসাইজের কথা বলছেন, আমি আরেকটা ছোট্ট উদাহরণ দিই। আমি হেলথ প্রজেক্টে কাজ করতাম নর্থ বেঙ্গলে। একটা হিন্দু-পাড়া। তো সেখানে মেয়েদের বাচ্চা হতো গোয়াল-ঘরে। গরুকে পাশে রেখে। হিন্দু ধর্মে তো গরুর উপস্থিতিতে সন্তান হওয়া পুণ্যের ব্যাপার। কিন্তু আমাদের পাবলিক হেলথের জায়গা থেকে এটা তো খুব আনহাইজেনিক একটা প্রাকটিস। এটা তো ঠিক না। কিন্তু তারাও কোনোভাবেই মানবে না। তারা বলছেন যে, আমি যখন ঈশ্বরের মুখোমুখি হবো আপনি থাকবেন? এটা আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস। এখন আমি একে সংস্কার বলতে পারি, এক ধরনের পশ্চাৎপদতা বলতে পারি, কিন্তু আমি তো তাকে আমার ধারণা চাপিয়ে দিতে পারি না। আমি তো জোর করে তাকে বাধ্য করতে পারি না গোয়াল-ঘরে বাচ্চা না-হওয়াতে। আমার তো তার সাথে নেগোশিয়েট করতে হবে। একটা মাঝামাঝি জায়গায় আসতে হবে। যতোক্ষণ পর্যন্ত এর একটা মিডল-গ্রাউন্ড তৈরি করতে না পারি, সিন্থেসিজ তৈরি করতে না পারি, কাজ তো হবে না। আমাদের দীর্ঘ আলাপ হলো। আমরা বোঝালাম এর স্বাস্থ্য-ঝুঁকির কথা; তারপর বললাম—ভিন্ন একটা ঘরে প্রসব হোক এবং সেখানে যদি একটা গরুর ছবি রাখি তাহলে চলবে কিনা। অনেক আলাপ-আলোচনার পর তারা রাজি হলো এতে। কোনো না কোনোভাবে গরু, ফিজিকালি না হলেও তার একটা উপস্থিতি থাকতে হবে। তাহলে তার

~ www.amarboi.com ~

বিশ্বাসকে সম্মান করেই আমরা একটা পথ তৈরি করতে পারলাম। তো, এরকম সিস্টেসিজের জায়গা অনেক আছে। আমরা করি কী-না সেটা হলো প্রশ্ন।

সারা পৃথিবী এবং বাংলাদেশ একটা বিশেষ ক্রান্তির ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। একেকটা প্রজন্ম-কে একেকটা বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়। এক-একটা প্রজন্মের কাছে একেকটা সামাজিক প্রশ্ন প্রধান হয়ে ওঠে। আপনাদের প্রজন্মের মূল-প্রশ্নটা আপনাদের নিজেদের খোঁজা উচিৎ। তার মোকাবেলা করা উচিৎ। সেটা মোকাবেলা যে শুধু একটা প্রজন্ম করবে তা তো না। সবাই মিলেই করবে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্নভাবে হয়তো। নিজেদের সময়ের মূল প্রশ্নগুলো চিহ্নিত করতে যতোটা সম্ভব উন্মুক্ত থেকে নিজেদেরকে তৈরি করা দরকার। সেটা ব্যক্তি-জীবনে, সামাজিক-জীবনে। কেউ হয়তো কোনো সংগঠন করবেন না, ক্রিয়েটিভ কাজে থাকবেন না, কিন্তু শুধু একটা ব্যক্তিগত জীবনযাপন করতে হলেও আমি মনে করি সময়ের যে প্রশ্ন, সে প্রশ্নের সাথে নিজেদেরকে যুক্ত করবার দরকার আছে। একটা ভালো ব্যক্তি-জীবনের, পারিবারিক, দাম্পত্য-জীবনের জন্য হলেও সময়ের পালসটা বোঝা দরকার। আমরা সবাই একটা বিশেষ সমাজ, বিশেষ সময়ের ভেতরে আছি। সেটা বোঝা খুব জরুরি। এমন একটা বয়সে আপনারা আছেন যখন কারো বিশেষ এজেন্ডা, কারো বিশেষ স্বার্থের বাইরে থাকার সুযোগ আছে আপনাদের। একপর্যায়ে নানা-রকম জীবিকায় জড়াবেন তখন হয়তো আপনাকে কাউকে না কাউকে সার্ভ করতে হবে। কিন্তু এখনও হয়তো সেই সুযোগটা আছে অন্যকে সার্ভ না করেও নিজের মতো করে নিজের জায়গাটা তৈরি করার। আমি সবসময় মনে করি বাংলাদেশের অনেক সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমরা বিভ্রান্ত হয়ে যাই। চিন্তার ফ্রেমওয়ার্কেও বিভ্রান্তি আছে। আমরা যদি আমাদের নিজেদের পথটা খুঁজে নিতে পারতাম, আমাদের নিজেদের পথটা আরো একটু বুঝতে পারতাম তাহলে বহু কিছু অর্জন করা সম্ভব। একটা দেশের উন্নয়ন তো শুধুমাত্র বড় বড় বিল্ডিং, ব্রিজ দিয়ে হয় না। সেটার একটা মোরাল গ্রাউন্ড লাগে, চিন্তার জায়গা লাগে। চিন্তা-চর্চা ছাড়া পৃথিবীর কোন দেশের উন্নতি হয় না। আমরা তো নলেজ প্রোডিউসই করি না। শুধু কনজিউম করি। বাংলাদেশ ইউরোপ না, বাংলাদেশ ভারতও না, বাংলাদেশ বাংলাদেশ। আমাকে গ্লোবালি নিজেদের প্লেস করতে হবে। আমাদের আর্থ-সামাজিক, ঐতিহাসিক এবং ব্যক্তিক অভিজ্ঞতাটা ভিন্ন এবং সে ভিন্নতাকে বুঝতে হবে। সেই ভিন্নতা নিয়েই আবার পৃথিবীর সাথে মিলতে হবে। সেটা কোনো রাজনৈতিক এজেন্ডা দিয়ে বুঝলে হবে না। জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে বোঝা দরকার। তারপরে আপনারা সিদ্ধান্ত নেবেন। আমার সব কথা সত্য ভাবার কারণ নাই। কিন্তু যদি এই কথাগুলোর ভেতরে কোনো চিন্তার একটা সূত্র থাকে সে সূত্রকে অন্যভাবে কাজে লাগিয়ে আরেকজনের চিন্তার সাথে যোগসূত্র করে নিজের মতো করে একটা ভাবনা বৃত্তান্ত তৈরি করতে পারেন। যেক্ষেত্রেই

~ www.amarboi.com ~

আপনারা কাজ করেন, যে পেশায় চলে যান না-কেনো আমি মনে করি এটা খুব জরুরি একটা কাজ। এই বাংলাদেশটা আপনারাই তৈরি করবেন। আমরা অনেক সময় মনে করি, আমি সামান্য একজন মানুষ আমি আর কি করতে পারি। কিন্তু কেউ আসলে সামান্য না। ছোট ছোট সবরকম ভূমিকাই একটা অভিঘাত তৈরি করে। আপনারা জানেন যে, মেট্রোলজির একটা টার্ম আছে, বাটারফ্লাই ইফেক্ট নামে। যারা শোনেননি তাদের জন্য বলছি যে, একটা প্রজাপতিও একটা টর্নেডো বন্ধ করতে পারে, টর্নেডো ঘটাতেও পারে। কারণ, টর্নেডো তৈরি হয় একটা বিশেষ নিম্নচাপ যখন তৈরি হয় তখনই। বাতাসের ভেতরে লক্ষ কোটি যে কম্পন হচ্ছে সেগুলোর একটা কম্বিনেশন হচ্ছে এবং এগুলো নির্দিষ্ট একটা সময়ে এসে একটা নিম্নচাপ তৈরি করে তখন টর্নেডো হয়। একটা প্রজাপতি যে এখান থেকে ওখানে উড়ে গেলো এটার ভেতর দিয়ে সে যে বাতাসের কম্পনটা তৈরি করলো তাতে কিন্তু সে বাতাসের চাপের একটা তারতম্য ঘটিয়ে দিলো, সেটা আবহাওয়াতে অভিঘাত তৈরী করছে। হয় সে টর্নেডোটা বন্ধ করছে কিংবা টর্নেডোটা ঘটিয়েছে। আমরা আমদের ছোট্ট ছোট্ট জীবন দিয়ে যা যা করছি, আমরা মনে করছি, এটার কোনো ভুমিকা নাই জগতের বড় বড় সব ব্যাপারে। আসলে কিন্তু আছে।

প্রশ্নকর্তা ৪ : বাংলাদেশের মেডিকেল সায়েন্স ইংরেজিতে পড়ানো হয়। মেডিকেলের সিলেবাস এবং ইন্সট্রাকশনগুলো ইংরেজিতে হয়, এই জায়গা থেকে কি আপনার মনে হয় যে, বাংলা ভাষায় চিকিৎসাবিজ্ঞান চর্চা জরুরি। অন্যান্য জায়গাগুলোর সাথে হয়তো ভৌগোলিক বা সাংস্কৃতিকভাবে মিলবে না, কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্পর্কে যে জ্ঞানগুলো আছে সেগুলো বাংলায় হতে পারে কি-না।

শাহাদুজ্জামান : এই প্রশ্ন দিয়ে আমিও এক সময়ে খুব তাড়িত ছিলাম। নিজেকে প্রশ্ন করেছি। আমি কোনো বোধিপ্রাপ্ত মানুষ না, বোধিচক্ষে যদিও কথা বলেছি। সুতরাং, গৌতম বুদ্ধের মতো কোনো বাণী দিতে পারবো না। কিন্তু যেটা আমি মনে করি পৃথিবী এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছে যে, ইংরেজি ভাষাটা জানা খুব জরুরি। আমরা এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছি যে, ইংরেজিকে পাশ কাটিয়ে কিছু করা যাবে না। ইংরেজির ওপরে দখল তৈরি করে সমান্তরালভাবে আমি মনে করি যে আমাদের বাংলাতেও বহু কাজ হওয়া দরকার। এই যে আপনারা বাংলায় আলোচনা করছেন সেটা খুব ভালো ব্যাপার। মেডিকেল সায়েন্সকে বাংলায় পড়তে হবে কিনা সেটা বিতর্কের ব্যাপার। তবে স্বাস্থ্য নিয়ে বাংলায় লেখা হওয়া উচিৎ, জার্নাল হওয়া উচিৎ। এক সময় এখানে 'গণস্বাস্থ্য' নামে একটা পত্রিকা হতো। ভালো পত্রিকা, এখন হয় কিনা জানি না। কিন্তু ইংরেজির ওপরে জোর দেয়া এখন অনেক জরুরি।

~ www.amarboi.com ~

ভাষার তো একটা হেজিমনি আছে। এখানে যতটুকু জ্ঞানই বা আমরা চর্চা করি না কেন, তৈরী করি না কেন, সেটা তো শুধু ভাষার কারণে পৃথিবীর কাছে পৌছাচ্ছে না। পৃথিবীর অনেক জ্ঞান আসলে প্রান্তিক জায়গায় চলে যাচ্ছে ভাষার কারণে। এটা একটা বড় সংগ্রাম। আমাদের এই উত্তর-ঔপনিবেশিক দেশগুলোর সংগ্রাম তো অনেক রকম। কিন্তু আমি মনে করি সত্তরের দশকের শুরুর দিকে একটা সিদ্ধান্ত হয়েছিলো যে-কোনো কিছুই ইংরেজিতে হবে না, বাংলায় হতে হবে সেটা ঠিক হয়নি। আমি ক্যাডেট কলেজে পড়তাম সেখানে আমাদের আর্মি কায়দার অ্যাটেনশন, স্ট্যান্ড এট ইজ এগুলোকেও বাংলা করে ফেললাম, সোজা হয়ে দাঁড়া, আরামে দাঁড়া ইত্যাদি। কিন্তু এটা খুব যে ভালো সিদ্ধান্ত হয়েছে তা আমি মনে করি না। ইংরেজিটা আমাদের দরকার ছিলো। ভারতের উদাহরণটা আমরা খেয়াল করতে পারি। ভারতে কিন্তু তারা শুধুমাত্র ইংরেজির দখলের কারণে আন্তর্জার্তিকভাবে জ্ঞানতত্ত্বের একটা স্থান করে নিয়েছে। পাশপাশি ওরা নিজস্ব ভাষা যে খারাপ জানে বা নিজস্ব ভাষায় যে কম কাজ হচ্ছে তা বলা যাবে না। তো সে উদাহরণটা অনেকক্ষেত্রেই আমি নিতে পারি। আমাদের বাংলা, ইংরেজি দুটাতেই সমান দক্ষতা থাকা দরকার।

আমার বই

~ www.amarboi.com ~

দীপেশ চক্রবর্তীর সাথে আলাপ
'প্রভিন্সিয়ালাইজিং ইউরোপ' আমার আত্মার প্রতিবাদ'

(প্রথমত তার লেখার সাথে পরিচয়, পরবর্তীকালে ই-মেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ এবং অবশেষে দীপেশ চক্রবর্তীর সাথে দেখা হয়েছে বেশ ক'বার ব্রিটেনে যখন তিনি বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা দিতে এসেছেন। আমার ব্রিটেন-বাসের সুবাদে যখনই তিনি এদেশে এসেছেন তার সঙ্গে আলাপের সুযোগ হাতছাড়া করিনি। এরপর ২০১৭-তে শিকাগোতে তার বাড়িতে অতিথি হয়ে গেলাম। অনেক আড্ডা হয়েছিলো সেবার। সেই সুযোগে তার একটা সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। তার বাড়ির পাশের লেক মিশিগানের পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে করা আমাদের আলাপ ধারণ করেছিলাম আমার মোবাইল ফোনে। সেই রেকর্ডকৃত আলাপের শ্রুতি-লিখন করেছেন ইলিয়াস কামাল রিসাত।

যে প্রসঙ্গ ধরে আলাপটা শুরু করেছিলাম সে বিষয়ে কিছু বলে রাখা প্রয়োজন। আমি আগের দুটো লেখায় জানিয়েছি যে, আমার গবেষণার একটি বিষয় হচ্ছে—'এন্ড অফ লাইফ কেয়ার' বা প্যালিয়াটিভ কেয়ার। বাংলায় যাকে বলা যায় 'মুমূর্ষ রোগীর উপশম সেবা'। এই গবেষণায় আমি দীপেশ চক্রবর্তীর 'ওয়েটিং রুম অব হিস্ট্রি' ধারণাটি ব্যবহার করেছি। এ নিয়ে আমি একটা জার্নাল-এ আর্টিকেলও লিখেছি। সেখানে আমি আলোচনা করেছি কীভাবে ইউরোপের মানদণ্ডে তৈরি হওয়া হাসপাতালভিত্তিক 'ভালো মৃত্যুর' ধারণার বিপরীতে ভারতের কেরালায় স্বেচ্ছাসেবীদের অংশগ্রহণে কম্যুনিটিভিত্তিক মুমূর্ষু রোগীর সেবার বিকল্প একটি মডেল তারা তৈরি করেছেন। সে সূত্রে আমি আমার গবেষণা-পত্রে আলোচনা করেছি যে, 'ভালো মৃত্যুর' কোনো সার্বজনীন সংজ্ঞা নাই। বরং ভালো মৃত্যুর ধারণার বস্তুত দুটো দিক আছে। একটি হচ্ছে Value অর্থাৎ কাকে বলছি ভালো মৃত্যু তার সংজ্ঞা, আর আরেকটি হচ্ছে Logistic বা সেই ভালো মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক এবং সামাজিক প্রস্তুতি। পৃথিবীর নানা প্রান্তের জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব Value এবং Logistic এর বোঝাপড়ার ভিত্তিতে নিশ্চিত করতে পারে 'ভালো মৃত্যু'। সেজন্য তাদের অত্যাধুনিক হসপিস তৈরি করার অপেক্ষায় 'ইতিহাসের বিশ্রামাগারে' বসে থাকবার দরকার নেই। আমি ভালো মৃত্যুর বহুত্বের ধারণার কথা বলতে চেয়েছি। এর

~ www.amarboi.com ~

সাথে দীপেশ চক্রবর্তী যে ভবিষ্যতের বহুত্ব বা আধুনিকতার বহুত্বের ধারণার কথা বলেছেন তার সম্পর্ক আছে। তার ভাবনার কাঠামোটি আমি আমার বিশ্বস্বাস্থ্য গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছি। তার সঙ্গে এই নিয়েই আলাপ শুরু করেছি, কিন্তু সে আলাপ নানাদিকে ডালপালা ছড়িয়েছে। আলাপ ঠেকেছে গিয়ে আধুনিকতা ধারণার বিভিন্ন অলি-গলিতে। ঘনিষ্ঠতার সূত্রে আমি তাকে দীপেশ দা বলেই সম্বোধন করি। এটা কোনো আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার না বরং ঘরোয়া আড্ডার ভঙ্গিতেই কথা হয়েছে। দীপেশ দার পূর্ব-পুরুষ বাংলাদেশের মানুষ। দীপেশ দা ঘরোয়া আলাপে কলকাতার প্রমিত ভাষার বদলে প্রায়ই বাংলাদেশের মুখের ভাষায় কথা বলতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন।)

শাহাদুজ্জামান : দীপেশ দা, আপনি বলছিলেন যে, ভ্যালুটা হিষ্ট্রি থেকে আসবে না।

দীপেশ চক্রবর্তী : হিষ্ট্রি তো একেকজনের একেক রকম। কোনো জায়গায় বৌকে পেটানো ভালো মনে করে, কোনো জায়গায় খারাপ। আপনি যদি খালি ইতিহাস দেখেন তাহলে রিলেটিভিজমে পড়ে যাবেন। বাংলাদেশে এরকম চলে, আরেকখানে এরকম চলে, এভাবে চললে তো কোনদিন সতীদাহ প্রথা বন্ধ করা যেতো না। ব্যাপারটা রিলেটিভিটির দিকে চলে যায়।

শাহাদুজ্জামান : তার আগে একটু পরিষ্কার হতে চাই যে, ভ্যালুটা হচ্ছে নর্ম, আর লজিস্টিক হচ্ছে হিস্টরি, সেভাবেই তো বুঝবো আমরা?

দীপেশ চক্রবর্তী : রাইট, রাইট। লজিস্টিক্স-টা হচ্ছে একটা সমাজের টেকনোলজিকাল, ইনস্টিটিউশনাল, সোশ্যাল প্রিপারেশন—এই নর্মগুলো মিট করার জন্য। সেইটাও ঐতিহাসিকভাবে হয়েছে। ধরেন, আমরা সব জায়গায় মেনে নিতে পারি যে, বৌকে মারা অপরাধ। কিন্তু বিভিন্ন সমাজে তার প্র্যাক্টিসটা তো এক রকম হবে না। এইটার ইতিহাসটা আলাদা। এই কারণে দার্শনিকেরা বললো—'তুমি যদি সবকিছু সমাজসাপেক্ষ করে ফেলো তাহলে তো পিউর রিলেটিভিজমের খপ্পরে গিয়ে পড়বা। তাহলে হবে কি, বাংলাদেশে চোখের উপর একটা অন্যায় হলে কেউ কিছু বলতে পারবে না। তাহলে তুমি সতীদাহ প্রথাও সাপোর্ট করে ফেলছো।'

শাহাদুজ্জামান : এই জায়গায় আপনার রেস্পন্স কি?

দীপেশ চক্রবর্তী : আমার রেসপন্সটা দুইটা মিশিয়ে হয়। আমি এই কথাটা মানি যে, ইতিহাস থেকে নর্মে পৌঁছানো যায় না। কিন্তু আমার কথা হলো আবার, ইতিহাসকে পিটিয়েও নর্মের কাছে নিয়ে আসা যায় না। ফলে, নরম্যাটিভ পন্থায় যারা ভাবে, তারা অনেক সমাজেই একটা মাইনরিটির অংশ। ধরেন, আপনি বিলেতে আছেন, পড়াশোনা করছেন, আপনি যা ভাবছেন, বাংলাদেশ নিয়ে যখন, বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে কোনো অন্যায় দেখেন তখন যেভাবে ভাবছেন, আপনি দেখবেন আপনার মতো করে ভাবে একটা সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর মানুষ। মানে,

~ www.amarboi.com ~

নির্যাতিত অর্থে সংখ্যালঘু বুঝাচ্ছি না। অল্প সংখ্যক মানুষই এটা ভাবে। বেশিরভাগ মানুষ অন্যভাবে ভাবে। প্রভিনশিয়ালাইজিং এ আমার বক্তব্য ছিলো, আমার তো ইউনিভার্সেল আইডিয়াগুলোকে ট্রান্সলেট করতে হবে। অর্থাৎ দেখতে হবে যে, এগুলো আমাদের জীবনে কীভাবে আনা যায়। এখন ধরেন, এখানে তফাতটা কি? রামমোহন আর বিদ্যাসাগরের দিকে তাকালে ব্যাপারটা আরো ইন্টারেস্টিং হয়। রামমোহন ইউনিভার্সেল আইডিয়া দিয়ে আর্গুমেন্ট করতেন। প্রভিনশিয়ালাইজিং ইউরোপে উইডো চ্যাপ্টারে আমি এনেছি এ বক্তব্য। রামমোহন বলতেন যে, তোমরা ওদের কষ্ট দেখতে পাও না মেয়েদের যখন পোড়াও? এদেরকে কষ্ট দিচ্ছে তা-তো দেখা যায়। সে-তো চিতা থেকে উঠে পড়তে চায়। তোমরা যে দেখতে পাও না কারণ, তোমাদের ইতিহাস তোমাদের অন্ধ করে রেখেছে। এই ইতিহাসটা থেকে মুক্ত হলে তোমরা দেখতে পেতে। তার ফলে কি হলো? রামমোহন রায় এখানে মাইনরিটি এবং ইংরেজদের আইন বা সহযোগিতা ছাড়া এটা বন্ধ করা যেতো না।

শাহাদুজ্জামান : কিছুক্ষেত্রে তো পিটিয়েও বন্ধ করেছে।

দীপেশ চক্রবর্তী : হ্যাঁ। একটা গল্প আছে। সিন্ধে যখন নেপিয়ার আসল, সে সতীদাহ বন্ধ করবে। তখন ব্রাহ্মণরা এসে বললো যে, না, এটা তো আমাদের প্রথা। তোমরা এভাবে এটা বন্ধ করতে পারো না। আমাদের প্রথা হলো তাকে স্বামীর সাথে পোড়ানো হবে। তখন নেপিয়ার বললো যে, ভালো। 'আমাদের প্রথা হলো : যারা এগুলো করে তাদের ফাঁসি দেয়া'। এটা শুনে ব্রাহ্মণরা বললো, ও তাহলে ঠিক আছে।

শাহাদুজ্জামান : হা হা। যেহেতু তুমি রাজা।

দীপেশ চক্রবর্তী : তোমার জোর বেশি যেহেতু তোমার হাতে আইন। কিন্তু ইতিহাসে কি হয়? ইতিহাসে হয় যে, যখন এই সেন্টিমেন্ট-টা আসলো যে, সতীদাহ খারাপ, তার ফলে অল্পসংখ্যক মানুষের মন বদলালো। বাকিটা আমার মনে হয় প্র্যাগম্যাটিজমে চলে। রামমোহনের হাতে সুবিধা ছিলো। তার হাতে বেন্টিং ছিলো। সে এসব করে-টরে আইন করার কথা বললো। রামমোহনকে বেন্টিং বললো—আমি তো আইনটা করতে চাই, কিন্তু, আমার তো কিছু ভারতীয়দের সিগ্নেচার দরকার। তা না হলে মনে হবে, আমি নিজেই সবটা করছি। তুমি সিগ্নেচার যোগাড় করো। কিন্তু সিগ্নেচার তো রামমোহনের বিপক্ষে বেশি পড়ছে। তারপর যেটা হলো সেটা প্রিন্সিপল না, প্র্যাগ্মেটিজম। বেন্টিং ভাবলো—কিছু লোক তো আইনটার পক্ষে বলছে, তার মানে অনেক ভারতীয় সতীদাহ বন্ধের পক্ষে। কাজেই তারা এনটাইটেল্ড এটা করতে। তারপরে তাদের হাতে পুলিশ-টুলিশ ছিলো। খানিকটা বন্ধও হয়ে গেলো। আর বিদ্যাসাগরেরও একই ডিলেমা ছিলো। এখন আমার কথা হচ্ছে, এইভাবে, তাইলে দেখেন আইন করার জন্য বেন্টিং কয়েকজন ভারতীয়ের সই চাইলেন। চাইলে সই ছাড়াও করতে

~ www.amarboi.com ~

পারতেন। তাইলে বেন্টিং খানিকটা ট্রান্সলেশনের উপর নির্ভর করতে চাইলো যে, কিছু কিছু ভারতীয় এই যুক্তির সারবত্তা দেখতে পাবে। এখন বিদ্যাসাগর করছেন কি, ঐ সারবত্তা দেখাতে গিয়ে উনি কিন্তু বলছেন 'পরাসরে এই কথা বলছে, মনুতে এই কথা বলছে বিধবা বিবাহ নিয়ে। তার সাথে তার চোখের পানি তো আছেই। বিদ্যাসাগরের কান্নাকাটি খুব বিখ্যাত। বিধবা দেখলেই তার কান্না পাইতো'।

শাহাদুজ্জামান : উনি আইনের কথা না বলে সবাইকে ধর্মের রেফারেন্স দিয়েই বুঝিয়েছেন যে, সতীদাহ ভালো না, তাই না?

দীপেশ চক্রবর্তী : হ্যাঁ, তিনি তর্কগুলো করছেন রিলিজিয়ন দিয়ে, কিন্তু আইন করালো ইংরেজ দিয়ে। রামমোহনেরও সে তর্ক আছে। এইগুলো একটা ট্রান্সলেশনের প্রসেস। ফলে ট্রান্সলেশনের পথটা কোনদিকে কতটা যাবে এটা আমরা পুরোটা আগে থেকে বলতে পারি না। এটাই ইতিহাসের অনিশ্চিতির মধ্যে থাকা। যারা নাকি খালি ভ্যালু দিয়ে ভাবে, নর্ম দিয়ে ভাবে, তারা মনে করে যে, ইতিহাসের অনিশ্চিতির ব্যাপারটা ইম্পর্ট্যান্ট না। এটা পিটাতে পিটাতে হয়ে যাবে।

শাহাদুজ্জামান : এখানে আমি আরেকটু খোলসা করতে চাই। তার মানে আপনি কি বলছেন ওদের ভ্যালু ঠিক আছে, কিন্তু আপনি প্রসেসের উপর গুরুত্ব দিতে চাচ্ছেন।

দীপেশ চক্রবর্তী : হ্যাঁ, প্রসেসকে গুরুত্ব দিতে চাই। আমার যেন না পিটিয়ে ভাবতে হয়। এবারে আমি হ্যাবিটেশন অব মডার্নিটির কথা বলি। ঐ বইয়ে যে আর্গুমেন্ট করেছিলাম যে, আমি যদি নর্মে বিশ্বাস করি, কিন্তু আমার দেশের বেশির ভাগ মানুষ করে না, তাহলে আমার একটা উপায় হলো যে, আমি আইন করবো। ফলে যারা নরম্যাটিভলি ভাবে তারা কোনোমতে আইনটা করে ফেলতে চায়। কিন্তু ওরা নরম্যাটিভ পন্থায় ঠিকই কিন্তু সেই নর্মের ইমপ্লিমেন্টেশনটা প্র্যাগমেটিক হয়ে যায়। ব্যাপারটা এমন যে ইউ.এন.এ-র চাপ আছে , আই.এল.ও-র চাপ আছে, করে ফেলো। কিন্তু আমার একটা বক্তব্য ছিলো প্রভিনশিয়ালাইজিং ইয়োরোপে, হ্যাবিটেশনেও বলেছিলাম—আমরা যদি ইউটোপিয়ান-ভাবে ডেমোক্রেসির কথা ভাবি, আমি কিন্তু রিলেটিভিজমের কথা বলছি না, আমি বলছি—আমি যে সমাজে জন্মেছি সেই সমাজের অবস্থা যদি এমন হয় যে, সতীদাহ প্রথা হওয়া উচিৎ না বা মেয়েদের উপর অত্যাচার করা উচিৎ না, আমি ঐ নর্মে বিশ্বাস করলেও আমার সমাজের প্রিভেলেন্ট প্র্যাকটিস হলো—অত্যাচার করা, তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে? আমি বলেছি যে, তাহলে এখন আমার সমাজের সাথে একটা ডায়লগে ঢুকতে হবে। আমি যদি ডেমোক্রেটিকভাবে ডায়লগ করি অর্থাৎ শক্তির ক্ষমতা না নিয়ে, তাহলে আমাকে এই আউটকামের জন্যও তৈরি থাকতে হবে যে, আমার জীবদ্দশায় আমি জিততে না-ও পারি। দ্বিতীয়ত হতে পারে, আমার এই ডায়লগটা

~ www.amarboi.com ~

কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সেটা আমি আগে থেকে বলতে পারি না। ফলে আমার তার সাথে যেতে হবে এবং সেখানে আমার একটা বক্তব্য ছিলো যে যদি আমার পিটানি থেকে সরে আসতে হয়, তাহলে যার সাথে আমি ডায়লগ করতেসি আমার এই ডায়লগের মধ্যে তার সাথে একটা আইডেন্টিফিকেশন দরকার। একটা গভীর আইডেন্টিফিকেশন। যার ফলে আমি তাকে কখনই আনডেমোক্রেটিক্যালি পিটাতে পারবো না। আমাকে ক্ষমতা দিলেও। এবং এটার একমাত্র শর্ত— ডিসেন্ট্রালাইজেশন অব পাওয়ার। ধরেন, আপনার গ্রামে, ব্যাপারটা ভালো বোঝা যায় শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ পড়লে, উনি ম্যালেরিয়া নিয়ে বলতেসেন, ধরেন কলেরা হলে, গ্রামের বেশিরভাগ লোক বুঝতে পারে না এটা পানি থেকে হয়। এখন আপনি তাদের গিয়ে বোঝালেন। দেখলেন, কলেরা নিয়ে তারা ঐ কুসংস্কারেই বসবাস করে। এইবার কি আপনি জোর করে পুলিশ দিয়ে এর সংস্কার করবেন? নাকি আপনি গ্রামের লোকের সাথে এই শর্তেই কথা বলবেন যে প্রয়োজনে আপনিও কলেরায় মারা যেতে পারেন? এটা তখনি হতে পারে, মিটিগেশন অব ভায়োলেন্স, স্টেট এর ভায়োলেন্স, যদি আপনি ছোট কমিউনিটির মধ্যে থাকেন, যেখানে আমার এফেকশন থাকবে। যখন আমি সংখ্যা বাড়িয়ে দিব, এফেকশন থাকে না।

শাহাদুজ্জামান : বড় স্কেলে তো ডায়লগ সম্ভব না। আপনি যে আর্গুমেন্ট বলছেন সেটা তো ষ্টেট লেভেলে ফিজিবল না।

দীপেশ চক্রবর্তী : আমি যে একটা চূড়ান্ত ডেমোক্রেসির কথা ভাবি, এটার আইডিয়ালিস্টিক একটা অবস্থার কথা বললাম।

শাহাদুজ্জামান : তাহলে ব্যাপারটা কি এমন দাঁড়াচ্ছে যে স্টেট লেবেলে কিছুটা পিটানোর ব্যাপার থাকতে হবে?

দীপেশ চক্রবর্তী : ঐজন্য ওরা প্র্যাগমেটিক হয়ে যায়। ওরা নর্ম পর্যন্ত ইউনিভার্সেলি ভাবে। তারপরে প্র্যাক্টিকালি করতে গিয়ে প্র্যাগমেটিক হয়ে যায়। এখন রামমোহনের একটা সুযোগ ছিলো করে ফেলতে, বিদ্যাসাগরের সুযোগ ছিলো নর্মগুলো, ভ্যালুজগুলো ইমপ্লিমেন্ট করে ফেলতে।

শাহাদুজ্জামান : আমার প্রশ্নটা অবশ্য আরেকটু অন্য জায়গায়। আমি তাহলে কি কিছু ভ্যালুজ এর হায়ারার্কিক মেনে নিচ্ছি? ধরেন কনটেমপোরারী সময়ে যদি আসি, ধরা হলো প্রাইভেসি একটা ভালো ভ্যালু। কিন্তু আমার যে হিস্টরিকাল এক্সপেরিয়েন্স, আমার যে প্লেসের এক্সপেরিয়েন্স তাতে তো আমার মনে হইতে পারে যে প্রাইভেসি ধারণাটা বিশেষ কাজের কিছু না।

দীপেশ চক্রবর্তী : হ্যাঁ, সে অর্থে সব ভ্যালু তো ইউনিভার্সেল না। প্রভিন্সিয়ালে বলেছিলাম, ইউরোপের সব কিছুই ইউনিভার্সেল মনে হচ্ছে। কিন্তু সব তো নাও হতে পারে। কিন্তু ধরেন বৌরে পিটানো যে খারাপ এটা হয়তো আর্গু করে বলতে পারি যে এটা একটা ইউনিভার্সাল ভ্যালু।

~ www.amarboi.com ~

শাহাদুজ্জামান : হ্যাঁ, বৌ পেটানো বিষয়টা না হয় বোঝা গেলো। কিন্ত ইন জেনারেল এই ইউনিভার্সাল ভ্যালু হয়ে ওঠার সিদ্ধান্ত কে দেবে? কোনটা ভালো, কোনটা ভালো না? কোনটা ইউনিভার্সেল কোনটা না, কিভাবে নির্ধারন হবে?

দীপেশ চক্রবর্তী : আপনি তাইলে ইউনিভার্সেলি যুক্তি দিয়ে বলতে পারেন যে, কি কারণে এটা ইউনিভার্সেল হতে পারে, পারে না। ধরেন আপনি বললেন প্রাইভেসি। এটা কান্টের কথা দিয়ে ভাবলে সবচেয়ে ভালো হয়। এই যে আমি প্রাইভেসি ভাবতেসি, বলতেসি, এইটা কি আমি সবার জন্য চাইতে পারি? আমার জন্য ইনক্লুডেড। কি যুক্তিতে চাইব? ফলে আপনি যদি প্রাইভেসি ইউনিভার্সেল ভাবেন, তাইলে এটাকে ইউনিভার্সেল ভাবার জাস্টিফিকেশনটা দিতে হবে।

শাহাদুজ্জামান : ধরেন যারা তা ভাবে তারা বলবে যে প্রাইভেসি থাকলে নানারকম সুবিধা হয়, ব্যক্তির অনেক অধিকার রক্ষিত হয় ইত্যাদি।

দীপেশ চক্রবর্তী : খুব সাধারণ একটা জিনিস বলি। প্রাইভেসি রোমান্স দিয়ে ভাবলে একরকম। প্রাইভেসির চেহারাটা কি হবে? আই মিন, ভিস্যুয়ালাইজেশন। এখানে আবার ইতিহাস চলে আসে। এখন আমি যদি বলি যে, প্রাইভেসি মানে সবার একটা করে নিজস্ব কামরা থাকতে হবে, ইউরোপ আমেরিকার মতো। কিন্তু আমার দেশে তো অত ঘর নাই। তাহলে এই ধরনের প্রাইভেসি া প্র্যাকটিকালি ফিজিবলও না আমার দেশে। তাহলে আমার দেশে প্রাইভেসির ধারনাটা কীভাবে তৈরি হয়েছে সেটা ভাবতে হবে। আলটিমেটলি, মানুষের একটা সেন্স অব গুড লাইফ একটা জায়গা থেকে তো অরিজিনেট করেছে। আপনি যে ভ্যালু দিয়ে গুড লাইফ ভাবতেসেন, এটার সাথে তখন একটা কথোপকথন দরকার। তাইনা? মানে, ইউনিভার্সেলি আমি গুড লাইফ বলতে কি ধরব? অমর্ত্য সেন বললেন যে ক্যালরি ইনটেক, পড়াশোনা করতে পারা ইত্যাদি.

শাহাদুজ্জামান : ইনফ্রাস্ট্রাকচার ভালো হওয়া...

দীপেশ চক্রবর্তী : শিক্ষা, স্বাস্থ্য...এইগুলোতে কোন আপত্তির জায়গা নেই। আপত্তির জায়গাটা তখনি হয় যখন আপনি দেখবেন না যে ঐখানে পৌঁছাতে গেলে আমাদের ইতিহাসের একটা ব্যাপার আছে, সেটাকে এমেব্রেস করতে হবে।

শাহাদুজ্জামান : খুবই ঠিক। অবশ্য আমি এ প্রশ্নও তো করতে পারি যে আদৌ তাদের দেয়া গুড লাইফে সবাইকে পৌঁছাতে হবে তাও বা কেন?

দীপেশ চক্রবর্তী : নিশ্চয়ই। ইতিহাস এমব্রেস করা মানে, না পৌঁছাইতেও পারি। দুইটা কারণে। একটা হলো যে, আপনি দিতে পারেন পুরাটা, নাও দিতে পারেন। আপনি কি তাকে জোর করবেন?

শাহাদুজ্জামান : না জোরটা তো এভোয়েট করতে হবে। কিন্তু আমাদের হেল্‌থ ফিল্ডে যেমন ধরেন, আমরা শিশুমৃত্যু কমাতে চাই। তো তারা বলবে আমরা প্রমাণ করেছি যে, এই বিশেষ নর্মগুলোকে প্র্যাকটিস করলেই কেবল চাইল্ড মর্টালিটি কমবে। তো শিশুমৃত্যু কমাতে হলে এই টীকা দেয়া, ডায়রিয়া হলে

~ www.amarboi.com ~

স্যালাইন খেতে দেয়া এসব প্র্যাকটিস তোমাকে করতে হবে, এটা ইউনিভার্সাল একটা ব্যাপার। এখানে নেগোসিয়েশনের জায়গাগুলো কোথায়?

দীপেশ চক্রবর্তী : আমার বলার কথা হলো—আমি যখন আরেকটা সমাজে যাবো, তখন আমাকে ভাবতে হবে যে, সেই সমাজ একটা বিশেষ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে এখানে এসে পৌঁছেছে, এবং সেখানকার মানুষেরও কিছু ধারণা আছে যে, কেমন জীবনটা ভালো জীবন? যেমন, মুসলমান সমাজ ভাবলো যে, হজ্বে যেতে পারলে তার জীবনটা ভালো। তাদের যে, নিজস্ব ধারণাগুলো আছে, আর আমি যে ধারণাগুলো নিয়ে আসছি, যে-কোনো সমাজে তো এটার ভেতরে একটা ডায়লগ/ ডিবেট হতে হবে। আমি বাংলাদেশ নিয়ে ভাবলে , আবুল মনসুর আহমদ থেকে আহমদ ছফা পর্যন্ত ভাবি। এখন তারা সব মোল্লাবিরোধী। কিন্তু মোল্লা তো একটা রিয়ালিটি, তারা আছেন।

শাহাদুজ্জামান : আপনি কি বলছেন একজন মোল্লাবিরোধী হলেও তাদের সাথে একটা নেগোসিয়েশনের ভেতর আসতে হবে?

দীপেশ চক্রবর্তী : হ্যাঁ, তাই বলছি। কিন্তু এখানে আমার মনে হয় যে, 'থিওরি অব ইনফিনিট প্যাশান্স' দরকার। বিশেষ করে ডেমোক্রেসির কথা বলতে গেলে এই ইনফিনিট প্যাসেন্সের খুব দরকার।

শাহাদুজ্জামান : আবার একটু ইউনিভার্সাল ভ্যালুর প্রশ্নে আসি। আপনি বলছেন একটা ভ্যালুকে নর্ম হিসেবে নিয়ে একটা নেগোসিয়েশানের মাধ্যমে কোনো সমাজে সেটা ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। আমি একটু পেছনে গিয়ে জানতে চাচ্ছিলাম যে কোন ভ্যালুটা ভালো সেটা কে সিদ্ধান্ত নেবে? যেমন আমি বলছিলাম 'প্রাইভেসির' ধারণা সার্বজনীনভাবে ভালো তা কি করে বলি?

দীপেশ চক্রবর্তী : সেখানে আবার দুইভাবে ভাবতে হবে। একটা হচ্ছে সেই ভ্যালুটাই ভালো কি-না, কিম্বা সেই ভ্যালুটা এই সমাজের জন্য ভালো কি-না। আমি যদি বলি সেই ভ্যালুটা এই সমাজের জন্য ভালো না, তাইলে কিন্তু আমি তর্কটাতে হেরে যাবো। কারণ, যারা সার্বজনীনভাবে আর্গু করে তারা বলবে তুমি তো আবার রিলেটিভিজমের মধ্যে গিয়ে পড়তেস।

শাহাদুজ্জামান : এ্যাবসলিউট রিলেটিভিজমের কথা না হয় বাদ দিলাম কিন্তু ধরেন একটা ক্রিটিকাল রিলেটিভিজম কি বাদ দেয়া যাবে?

দীপেশ চক্রবর্তী : রিলেটিভিজমে গেলে আপনার কনট্রাডিকশন তৈরী হবে। কতগুলো ভাববেন সার্বজনীন, কতগুলো না। তাইলে কি যুক্তিতে ভাবতেস এটা সার্বজনীন না। এই যুক্তিটা যদি সমাজসাপেক্ষ হয়ে যায়, তাহলে রিলেটিভিজমে পড়বেন। তাহলে, আপনার যেটা করতে হবে, ইউনিভার্সেলের ভেতরেই এটা ঢোকাতে হবে। প্রভিন্সিয়ালাইজিং ইউরোপে আমার বক্তব্য ছিলো, যে তোমরা যেগুলো ইউনিভার্সেল বলতেস অলরেডি তোমাদের কথাতেই সমাজসাপেক্ষ ব্যাপারটা আছে। কোনোটাই ইউনিভার্সাল না। সেটা কি-রকম? যেমন ধরেন,

~ www.amarboi.com ~

সেলফের ধারণা কি? অটোনমি অব দ্য সেলফ। যার মধ্যে প্রাইভেসি আসে। এইটা কি ইউনিভার্সেলি ভালো? ইউরোপ তুমি যখন একে ভালো বলে ডিফাইন করো, তখন তোমাকেও কিন্তু এর মধ্যে অনেক কোয়ালিফিকেশন আনতে হবে। তোমাকে ভাবতে হয় যে, অটোনমি অব দ্য সেলফ যেন একদম সেলফিশনেস না হয়ে যায়। তোমারও সেটা চিন্তা করতে হয়। তোমার সমাজ তো পারফেক্ট না, ফলে তোমার সমাজেও অটোনমী অব দি সেলফ-এর প্রসেসটা খেয়াল করতে হয়। তোমার সমাজের মধ্যে নানা রকম আইডিয়া আছে, তার মধ্যে এই অটোনমীর আইডিয়াটা কীভাবে নেগোশিয়েট করতেস? তোমার নেগোসিয়েশনের প্রশ্নের মধ্যে এই প্রশ্নগুলো তো উঠেছে যে, কোনটা ডেমোক্রেটিক, কোনটা আনডেমোক্রেটিক। আমি তো একই প্রশ্ন নিয়ে আসছি আমার ইতিহাসে। আমার দেশের ঐতিহাসিক প্রিপারেশন অন্যরকম। ফলে আমি রিলেটিভিস্ট হইতেসি না। আমি বলছি, তুমিও ট্রান্সলেশন করছো, আমিও ট্রান্সলেশন করতেসি। আমি এই প্রাইভেসির ধারনা আমার মতো নেগোশিয়েট করে নিবো। তার ফলে পৃথিবীর মধ্যে একটা আইডিয়ার যে, বিভিন্ন রকম এন্ড পয়েন্ট হইতে পারে, এটা তো সেই যুক্তিটাকেই ফলো করে।

শাহাদুজ্জামান : খুব ঠিক। একদম পরিষ্কার কথা। এক একটা ভ্যালু যখন প্রাকটিসে যাবে—তখন তখন তার এন্ড পয়েন্ট ডিফারেন্ট হতে পারে। মানে, ধরা যাক ডেমোক্রেসি বলতে ইউরোপ যে সংজ্ঞা দিচ্ছে তার ভিস্যুয়াল রূপটা তো অন্যরকম হতে পারে।

দীপেশ চক্রবর্তী : নিশ্চয় হতেই পারে। কিন্তু কথা হচ্ছে যেহেতু আমরা পৃথিবীতে একসাথে চলতেসি ফলে, ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপের মধ্যে তো ইন্টারফেস দরকার। মুশকিল হলো, আমরা সবাই সব সরকার। এটা ফুকো থেকে বুঝা যাবে। ভালো সরকার কিংবা এডিমিনিস্ট্রেশনের কাজ হচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লংজেভিটি বাড়ানো। এখানে গিয়ে আমার মনে হয়, লিবারেল চিন্তার একটা সমস্যা আছে। যখন বলছি, সব মানুষের এসব নিশ্চিত করতে হবে। সব বলতে আমি ইন্ডিভিজুয়াল মানুষের সামেশন বুঝাচ্ছি। তার মানে, কোন ওয়েলফেয়ার স্টেটে এমন হবে না যে, একটা খুব আনইকুয়াল সমাজ কিন্তু তার ওভারঅল সম্পদ বাড়লো সেটা ওয়েলফেয়ার স্টেট সাপোর্ট করবে না। ইন্ডিয়ায় যেমন ১% লোক ৬০% সম্পদ ঔন করে। ফলে ইন্ডিয়ার ওয়েলথ বাড়ছে, কিন্তু ওয়েলফেয়ার আর হলো না। ফলে ওয়েলফেয়ারটা সবসময় ইন্ডিভিজ্যুয়াল দিয়ে ভাবা। তার ফলে ওদের ঐ চিন্তার সমস্যা হলো—মানুষের সংখ্যা কত হলো, তার ফলে কি প্রব্লেম হতে পারে, এগুলো ওরা চিন্তা করে না। ভাবে-কোনভাবে হয়ে যাবে। টেকনোলজি দিয়ে, সার দিয়ে সবার চাহিদা মেটানো যাবে। ওরা সবসময় বলে, খাওয়ানোটা সমস্যা না।

শাহাদুজ্জামান : মানে প্রশ্নটা ডিস্ট্রিবিউশনের?

~ www.amarboi.com ~

দীপেশ চক্রবর্তী : তারা ভাবে ডিস্ট্রিবিউশন ঠিকভাবে করলে সব ঠিক হয়ে যাবে। ফলে শিশুকে বাঁচাতে হবে, মাকে বাঁচাতে হবে, বেশিদিন বাঁচতে হবে ইত্যাদি। তারা বলে, এগুলো নিয়ে আপত্তি করো কেন?

শাহাদুজ্জামান : ঐ যে আপনি বলছিলেন ওয়েলফেয়ার স্টেট ইন্ডিভিজুয়াল দিয়ে ভাবে। সেটা আমি হেলথ ফিল্ডেও দেখি। আমি কাজ করি গ্লোবাল হেলথে সেখানকার হেলথ ইনটারভেনশন মডেলগুলো এখনও ইনডিভিজুয়াল বেইজড। আমাদের এখানে যে কালেকটিভিটি আছে সেটাকে ব্যবহার করে হেলথ ইন্টারভেনশনের চেষ্টা বিশেষ নাই।

দীপেশ চক্রবর্তী : সেটাতে কি ওরা আপত্তি করে?

শাহাদুজ্জামান : গ্লোবাল হেলথ ইন্টারভেনশন করতে গেলে এখানে কিন্তু কালেক্টিভিটির আইডিয়াগুলোকে কম্প্রোমাইজ করতে হয়। মানে মডেলটা তো ইন্ডিভিজ্যুয়ালাইজড মডেল।

দীপেশ চক্রবর্তী : তাছাড়া এধরনের স্বাস্থ্য প্রকল্পের ভেতর একটা সময়ের চেতনা আছে। আপনি বললেন যে, এই প্রজেক্টটা ২০ বছরের মধ্যে করতে হবে। তাহলে চাপ পড়ে তো। আপনি যদি বলতেন যে, আমার হাতে অনেক সময় আছে। এর মধ্যে ইমপ্লিসিট একটা সময় বেঁধে দেয়া আছে। যেমন, কোনো সরকার যদি বলে যে, ৫০০ বছর পর তোমার জীবন আমি বাড়িয়ে দিবো, সেই সরকারের কোনো লেজিটিমেসি নাই। আসলে এঁর ভেতর একটা ইমপ্লিসিট টাইম হরাইজন আছে। এখানেই গোলমাল হয়। আইডিয়াল ডেমোক্রেসির কন্ডিশন ইজ ইনফিনিট প্যাশান্স। স্টেট লেভেল দিয়ে করলেই তো ঐখানে ঐ সময় নির্দিষ্ট প্রজেক্টগুলো এসে পড়ে।

শাহাদুজ্জামান : আবার স্টেট ছাড়া একাজগুলো করতেও তো পারবেন না।

দীপেশ চক্রবর্তী : আমার ছেলের মাঝে মাঝে সাইকোলজিকাল সমস্যা হয়, এক্সট্রিম অবস্থা হয়। এখন মাথা খারাপের কিছু আইন আছে, অস্ট্রেলিয়াতে, ইংল্যান্ডেও। একটা সময় ও খুব ভায়োলেন্ট হয়ে গিয়েছিলো। এখন, আইন আছে ভায়োলেন্ট হলে কিন্তু জোর করে হাসপাতালে দেয়া যায় না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে যায় না। তার জন্য সরকার কোর্টে যায়। কোর্টের পারমিশন লাগে। পুলিশ এসেই ফোর্স করতে পারে না। কোর্টের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে করতে হয়। সাইকিয়াট্রিস্টকে বলতে হয় যে, হ্যাঁ এরকম করলে ভালো হয়। ওর যখন এরকম হলো, তখন ওকে একবার জোর করা হলো। দ্বিতীয়বার যেটা হলো, আমি আর ওর মা আমরা ঠিক করলাম যে, ওকে হাসপাতালে দিবো না। ওকে আমরা তো ভালোবাসি। ও বাসায় থাকবে। আমরা ভাবলাম যে, এতো ইনডিগনিটি ওকে দিবো না। এই যে ডিসিশনটা নিলাম, এটা একমাত্র ভালোবাসার মধ্যে নেয়া যায়। মানে আপনার জীবনের যে টাইম হরাইজন, তার মধ্যে আপনি যাকে ভালোবাসেন সত্যিকার অর্থে উইথ রেসপেক্ট টু দ্যাট পার্সন আপনার ইনফিনিট

~ www.amarboi.com ~

প্যাশান্স আছে। আমি সবসময় বলি যে, এই প্রিন্সিপাল-টা কি আমরা পলিটিক্স-এ আনতে পারি না? এটা আনার শর্ত কিন্তু ডিসেন্ট্রালাইজেশন।

শাহাদুজ্জামান : এটা ছোট স্কেলে হয়তো চর্চা করা সম্ভব, কিন্তু বড় স্কেলে তো ডিফিকাল্ট।

দীপেশ চক্রবর্তী : হ্যাঁ, কঠিন নিঃসন্দেহে। গান্ধী যে বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলতেন, এটা একটা ইউটোপিয়ান কথা। এটার সাথে এই ডেভেলপমেন্ট মডেলটা চলে না। উনি বললেন—আল্টিমেটলি, তোমরা যে ডেভেলপমেন্টের কথা বলছো ইমপ্লিসিটলি সেটা তো স্টেট-নির্ভর। তোমরা ধরে নিচ্ছো স্টেট আইন করবে এসব করার। নরম্যাটিভের মধ্যে কিন্তু স্টেটের কথা নাই। ফলে তুমি ধরে নিচ্ছো ইতিহাসে একটা স্টেট আছে।

শাহাদুজ্জামান : ধরেন, আধুনিক ইউরোপ যা কিছু এচিভ করেছে তা তো স্টেটের থ্রু-তেই।

দীপেশ চক্রবর্তী : আমি ইউরোপরে বলি, ইউরোপ তুমি তোমার নরম্যাটিভ ভাবনারে যখন ভিজ্যুয়ালাইজ করতেস, তখন তোমার সেখানে একটা ইতিহাস আছে যেখানে স্টেট রয়েছে। এবং স্টেটের একটা হেজেমনি রয়েছে। এবার তুমি যখন অন্য একটা ইতিহাসে যাও যেখানে ফরমাল স্টেট হইলেও তার হেজেমনি হয় নাই তখন তোমার চিন্তাটার দৈন্যতাগুলো আমি দেখতে পাই। এই স্টেট যার কোনো হেজেমনি হয় নাই, রণজিত গুহের মতে 'ডমিন্যান্স উইদাউট হেজেমনি'। সে ষ্টেট তখন আরো মারে। সে হয় আরো মারে নাহলে আরো করাপ্ট হয়। সে আইন করে, সেটা ইমপ্লিমেন্ট করে।

শাহাদুজ্জামান : সেজন্যই আমি ভ্যালুর জায়গায় প্রশ্ন তুলতে চাচ্ছিলাম। বলতে চাচ্ছিলাম যে, আমরা আমার মতো করে ভ্যালুজগুলো অর্জন করতে পারি কিনা।

দীপেশ চক্রবর্তী : মনে রাখতে হবে ভ্যালুজের ভিতরে ইমপ্লিসিট হিস্টরি আছে। এই অর্থে তুমি এই ধরে নিয়েছো যে, একটা স্টেট আছে। একধরনের ইতিহাস ধরে নিয়ে বলতেস, ভ্যালু। ভ্যালুগুলো ইম্পলিমেন্ট করতে চাও। এবং ধরে নিচ্ছো সেখানে স্টেটের একটা হেজেমনি আছে। কিন্তু আমাদের দেশে তো সে সব নাই। স্টেট তো সেরকম না।

শাহাদুজ্জামান : এখন ধরেন যে, হিউম্যান ডেভেলপমেন্টের যে এচিভমেন্টের কথা তারা বলে, সেটাও তো হয়েছে একটা হিস্টরিকাল প্রসেসে। ধরেন, ইউকে-তে এই যে গুড ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি হয়েছে সেটার পেছনে তো খুব বাজে ইতিহাসও আছে। একটা এক্সপ্লয়েটেটিভ প্রসেসের ভেতর দিয়ে তারা রিসোর্সটা তৈরি করেছে, সেটা দিয়ে নানা ইন্সটিটিউট এস্টাবলিশ করেছে।

দীপেশ চক্রবর্তী : কথা তো সেটাই। আমি সেটাই বলছি যে, তুমি যখন ভ্যালুগুলো ভিজ্যুয়ালাইজ করতেস, সেটাতে হিস্টরি বসে আছে। সেই এরিয়া অব

~ www.amarboi.com ~

লাইফ যেটাতে স্টেট ইন্টারফেয়ার করতে পারে নাই। নর্মের মধ্যে অলরেডি একটা পলিটিকাল রাষ্ট্রের চিন্তা থাকে, কারণ, রাইটস থাকা মানেই একটা ইনস্টিটিউশন থাকবে, যেটা সেই রাইট এডমিনিস্টার করবে। আপনি বলতে পারেন, আমারো একই গোল। কিন্তু আমি এটাই এচিভ করতে চাই, নট নেসেসারিলি, থিওরি অব রাইটস। আমি হয়তো সামাজিক অবলিগেশনের মধ্যে দিয়ে যেতে চাই। আমার প্রভিন্সিশিয়ালাইজিং ইউরোপ আর জন স্টুয়ার্ট মিলের যে লিবারেলিজমের বই, একসাথে পড়েন, তাইলে বুঝতে পারবেন যে, এরা তো একধরনের স্টেটের চেহারা ধরে নেয় যখন নানা ভ্যালুর কথা চিন্তা করে। নাগরিকত্ব আছে, অধিকার আছে। সেখান থেকে ফলো করে। আমাদের রাষ্ট্রের চেহারা ওরকম না, ফলে একচ্ছত্র আধিপত্যও থাকে না। এখানে গ্রামীণ সমাজ আছে, এগুলো ওভারল্যাপিং করে। আপনি ধরেন, গ্রামে একটা বোর্ড আছে, চেয়ারম্যান আছে, সালিশ হয়। তার মানে এখানে রাষ্ট্রের ভেতর দুইটা অথরিটি স্ট্রাকচার আছে। আমাদের তো প্যারালালি অনেকগুলো স্ট্রাকচার থাকে। আমাদের রাষ্ট্রগুলো সেসব ম্যানেজ করে চলে। ওতেও ডমিন্যান্স থাকে। ঐখানে হকের চাইতেও অন্যান্য অনেক কথা আছে। ফরজের কথা আছে। অনেক সময় সেসব দিয়েই এচিভ করতে হয়। ফলে আমার প্যারোকিয়াল হলো যে, অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ভ্যালুজগুলো অর্থাৎ পলিটিকাল ভ্যালুজগুলো ডিফাইন করতে গিয়ে তার মধ্যে রাষ্ট্র ঢুকে পড়ে। ধরেন, আবারো প্রাইভেসির কথা বলি। আমি যখনি বলব, এটা আইন করতে হবে তখন রাষ্ট্র থাকতে হবে। ওরা ধরে নেয় যে, রাষ্ট্রের একটা এলাইনমেন্ট আছে সমাজের সাথে। সমাজটাই একচুয়ালি রাষ্ট্র মিন করে এবং রাষ্ট্রের গঠনের আওতায় পড়ে গেছে।

শাহাদুজ্জামান : এখন ইউরোপ তো তাদের তৈরী ভ্যালুজগুলোও ট্রাপে পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সেগুলো কাউন্টার প্রোডাক্টিভও হচ্ছে। আমি আমার ডেথ ডাইং নিয়ে কাজটার কথা বলি। ওরা ডেথটাকে ইন্সটিটিউশনালাইজ করে ফেলেছে। এখন দেখতে পাচ্ছে যে, এন্ড অব লাইফ এর সময়টাকে ইন্সটিটিউশন দিয়ে হ্যান্ডল করা খুব মুশকিল। অলমোস্ট ইমপসিবল। স্ট্রাকচারালি, ইকোনমিক্যালি, প্রত্যেকটা মৃত্যুকে যদি ইন্সটিটিউশন দিয়ে হ্যান্ডল করতে হয়, এটার যে ফাইন্যান্স আছে, সেটা আর সম্ভব না। এখন ওরা চাচ্ছে—এটাতে কমিউনিটিকে যুক্ত করতে। বলছে, প্রতিবেশী মুমূর্ষু রোগীর সেবার দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে। কিন্তু সেটা তারা পারছে না, কারণ, তারা তাদের নিজেদের তৈরি ভ্যালুজের ট্রাপে পড়েছে। কম্যুনিটি ইনভলভ হতে চাচ্ছে না তার ঐ প্রাইভেসি, অটোনমি, ইন্ডিপেন্ডেন্স এসব ভ্যালুজ-এর কারণেই। প্রাইভেসী এতো গুরুত্বপূর্ণ যে চাইলেই তো আর প্রতিবেশীর ঘরে ঢুকে সেবা দেয়া যায় না। তাকে নানারকম সিকিউরিটি চেক করে তারপর অন্যের ঘরে ঢুকতে হয়।

~ www.amarboi.com ~

দীপেশ চক্রবর্তী : ওরা এখন স্টেটের ভেতর ফ্যামিলি স্ট্রাকচারকে ইউজ করার কথা বলছে।

শাহাদুজ্জামান : হ্যাঁ, কিন্তু পারছে না। সেটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে গেছে। ঐ জায়গায় আর্গু করছি যে, তাহলে ওরা যে ভ্যালুগুলো নার্চার করেছে এতদিন সেইটাই তো ওদের একটা প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দাঁড়াচ্ছে।

দীপেশ চক্রবর্তী : এখানেই আবারো ইমপ্লিসিট হিস্টরির কথা আসে। ঐ ভ্যালুজগুলোর একটা ইতিহাস আছে। তারা তো বরাবর বলে আসছে মানুষের অটোনমি যতদিন পারা যায়, বাড়াইতে হবে। এই যে, সত্তর বছরেরও যুবা হবে।

শাহাদুজ্জামান : তাকে যেন কখনোই কারো উপর ডিপেন্ডেন্ট হতে না হয়।

দীপেশ চক্রবর্তী : মুশকিল হলো, এখনকার লাইফ সেটিংটা টেকনোজেনিক হয়ে গেছে। ফলে আপনি বুড়া হয়েও অনেক বছর বাঁচতে পারেন। সেখানে ওদের কোনো উত্তর নাই। গুড ডেথ, নার্সিং হোমে গিয়ে দশ বছর পড়ে থাকবে। কেউ দেখে কি দেখে না কোন ঠিক নাই। এটা কি গুড ডেথ? ওর মধ্যে তো সব ভ্যালুজ কনট্রাডিক্টরি।

শাহাদুজ্জামান : এক্সাক্টলি। আমি ঐ জায়গাটাই আর্গু করতে চাচ্ছিলাম। ইউরোপের এইসব চিন্তার ভেতর তো অনেক কন্ট্রাডিকশন আছে। লাইফের ভ্যালু বাড়ায় টেকনোলজি দিয়ে। সক্ষমতা ছাড়া তো অটোনমি হয় না। তার ফলে সক্ষমতা বাড়ানোর কত রকম চেষ্টা। এই যে, জিম, দৌড়ানো। ফিজিকাল ফিটনেস তো এক ধরনের অবসেশনের মতো এখানে।

দীপেশ চক্রবর্তী : তারা চায়, যেইদিন আপনার সক্ষমতা চলে যাবে সেইদিনই আপনি ডেড। ইউথ্যানাশিয়ার যে আর্গুমেন্ট-টা, স্বেচ্ছামৃত্যু, এটা এই কারণেই আসতেসে। যতদিন বাঁচবে চূড়ান্ত ইন্ডিপেন্ডেন্স চায়। আমার এক চেনা মানুষ আছে, তার আলঝেইমার জাস্ট শুরু হইছে, কিন্তু সচেতন মানুষ ছিলেন। একদম পরিবারকে বলে-টলে একরাতে হোটেলে গেলো ঔষধ নিয়ে মরবে বলে। যখন তারা তাদের এইসব ভ্যালুজ প্র্যাকটিস করতে পারে না তখনই জীবনটাকে শেষ করে ফেলতে চায়।

শাহাদুজ্জামান : আমি সেটাই বলতে চাচ্ছিলাম।

দীপেশ চক্রবর্তী : সুতরাং ঐসব ভ্যালুজগুলো নিয়ে আমাদের সমাজের যে কন্ট্রাডিকশন, ওদের সমাজেও তা কন্ট্রাডিকশন। তাদের সুপ্রিমেসীর তো কিছু নাই।

শাহাদুজ্জামান : এই যে দেখেন, তারা প্রাইভেসি নিয়ে মহা-মাথা-খারাপ করছে, কিন্তু টোটাল স্টেট-স্ট্রাকচার দেখেন। আমার এমন কোনো ইনফরমেশন নাই যে স্টেট জানে না। আমি তো সারাক্ষণ সিসিটিভিসহ নানারকম সার্ভিলেন্সের আন্ডারে থাকি। তাহলে আমার প্রাইভেসিটা কোথায়?

~ www.amarboi.com ~

দীপেশ চক্রবর্তী : এগুলো তো সব লিবারেল ভ্যালু থেকেই ঢুকসে। এদের সমাজ নানাভাবে ভেঙে পড়সে।

শাহাদুজ্জামান : ওরা তো বলবে আমাদের এসব মডেল ফলো না করলে তুমি তোমার ঐ পোভার্টি আর কেওসের ভেতরই থাকবে, সেখান থেকে বের হতে পারবে না।

দীপেশ চক্রবর্তী : কথা হলো আমি তো কালকে চাইলেই তোমার মতো পয়সাওয়ালা হইতে পারবো না। আদৌ কোনদিন হবো নাকি ঠিক নাই। তোমার যা আছে সেগুলো আমার নাই, তাই বলে কি আমি আমার সমাজে, গুড লাইফ, গুড ডেথ নিয়ে ভাববো না? তার চেহারাটা কি তোমার মতো হবে?

শাহাদুজ্জামান : আমার আর্টিকেলে আমি এক্সাক্টলি সেই আর্গুমেন্টটাই করেছি দীপেশ দা। আমি বলেছি যে গুড ডেথ পাওয়ার জন্য আমি ওয়েটিং রুম অব হিস্ট্রিতে বসে থাকবো নাকি আমার ভ্যালু লজিস্টিক দিয়ে আমার মতো একটা গুড ডেথ আমি এচিভ করবো।

দীপেশ চক্রবর্তী : তাই তো। এখন ওদের এই অটনমি যদি সত্যি চিন্তাতে রাখতে হয় তাইলে সমাজে সকলকে সুইসাইড করার অধিকার দেয়া উচিৎ।

শাহাদুজ্জামান : ইউথ্যানাশিয়া তো কাইন্ড অব সুইসাইডই।

দীপেশ চক্রবর্তী : অস্ট্রেলিয়ায় এটা নিয়ে একটা আলোচনা হলো কিছুদিন আগে ন্যাশনালি, ইউথানাশিয়া হবে কিনা।

শাহাদুজ্জামান : নেদারল্যান্ডসহ কয়েকটা দেশে ইউথ্যানেশিয়া তো এলাউড।

দীপেশ চক্রবর্তী : এটা তো লজিক্যালি ফলো করে। ওরা যে নর্মের কথা বলে এগুলা তো গ্রো করেছে ক্যাপিটালিজমের গ্রোথের সাথে। সক্ষম বডির যে ভ্যালুজ সেটা তো একটা সোশ্যাল ভ্যালুজ।

শাহাদুজ্জামান : ক্যাপিটালিস্ট সমাজকে সার্ভ করার জন্যই এই নর্মগুলো তৈরি করা হয়েছে।

দীপেশ চক্রবর্তী : এজিং নিয়ে ওরা কি করবে ওরা বুঝতে পারে না। এজিং নিয়ে আমাদের একটা ধারণা আছে না সামাজিকভাবে যে, বুড়াকালে আমরা আস্তে আস্তে উইথড্র করবো সবকিছু থেকে। ওরা উইথড্র করার যুক্তিটাই পায় না।

শাহাদুজ্জামান : এখানে ডেথ কাফে বলে একটা ব্যাপার হয়। এক ধরনের মুভমেন্ট তৈরি হয়েছে। কফিশপে যেয়ে সবাই মৃত্যু নিয়ে আলাপ করবে আর কি! আমি কয়েকটাতে এটেন্ড করেছি। ওখানে এক বয়স্ককে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তোমার সবচেয়ে ভীতির বিষয় কি জীবনের শেষ মুহূর্তে? তারা প্রায়-সবাই বলে যে, 'টু লুজ মাই ইনডিপেন্ডেন্স' মানে আরেকজনের উপর নির্ভর করতে হবে এই ভাবনা তাদের ভীত করে তোলে। আমার বাবার শেষ মুহূর্তে পাশে ছিলাম, শেষ দিনগুলোতে আব্বা একেবারে বেড-রিডেন ছিলো। আমিও তাকে মাঝে মাঝে কাপড় টাপড় খুলে পরিষ্কার করতাম। আমার নিজেরই অস্বস্তি লাগতো। আমি

~ www.amarboi.com ~

আব্বাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে তোমার কি খারাপ লাগতেসে তোমাকে এই সময়ে এভাবে এসব করছি যে? আব্বা আমাকে বললো—মোটেও না। আমার তো মনে হয়, আমি তোমাকে একটা সুযোগ দিলাম আমাকে কেয়ার করার।

দীপেশ চক্রবর্তী : সেটাই কথা; আমার প্রাক্তন স্ত্রীর সাথে দেখা করলাম রিসেন্টলি। ক্যান্সারে আক্রান্ত সে। কেয়ার করছিলাম তার। আমি আমার এক বন্ধুকে বলছিলাম যে, মানুষ হিসেবে কেয়ার করার কথা। যেহেতু এটা মানুষের গভীর প্রয়োজন, যখন মানুষ অক্ষম হয়, তার তো কেয়ার লাগে। ফলে আমি বলছিলাম, পৃথিবীতে একটা কেয়ারের ব্যাংক আছে। সেই একাউন্টটা ব্যবহার করার সুযোগ সবাই পায় না। তো যেটা বলছিলাম; ওরা এটা স্বীকার করে না যে, নর্মগুলো একটা পার্টিকুলার ইতিহাস থেকে আসছে। স্টেটের ইতিহাস আছে, ক্যাপিটালিজমের ইতিহাস আছে। এই যে সমর্থ-শরীর আজীবন অটুট রাখার এজেন্ডা এর সাথে প্রোডাক্টিভিটির আইডিয়া, উন্নতির আইডিয়া আছে।

শাহাদুজ্জামান : এখন কথা হচ্ছে, ইউরোপের দেয়া সব আইডিয়াগুলো আমরা কি আনক্রিটিকালি নেবো না তাকে প্রশ্ন করবো?

দীপেশ চক্রবর্তী : এই কথাটাই গান্ধী বলেছিলেন। আমাদের লিডাররা তো গান্ধীকে খারিজ করে দিসে। তারা ভেবেছিলেন, ইউরোপের দেখিয়ে দেয়া পথটাই ভালো পথ। ঐ ইউরোপের পথটাই তারা ধরতে চেয়েছে। কিন্তু গান্ধী চ্যালেঞ্জ করেছেন।

শাহাদুজ্জামান : আপনার প্রভিনন্সিয়ালাইজিং বইয়ে আপনি আমাদের সেন্স অব ইনফিরিওরিটি তৈরি করার প্রক্রিয়াটা চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা সবসময় এমন একটা স্টেট অব মাইন্ডে থাকি যে, আমরা তো পারলাম না। আমরা সব পিছিয়ে-পড়া মানুষ আর কি! এটা তো খুব ক্ষতিকর।

দীপেশ চক্রবর্তী : কথা হচ্ছে, পৃথিবীর সব মানুষকে যদি আমেরিকার লেভেলে থাকতে হয় তাহলে তিন চার পৃথিবী লাগে, ফলে ওরা যেটা নর্ম সৃষ্টি করেছে, এটাতো এচিভ করা ইমপসিবল। তারা ভাবে—আমরা ব্যাকওয়ার্ড। আমরাও ভাবি—আমরা ব্যাকওয়ার্ড।

শাহাদুজ্জামান : ঐ বোধটা আমাদের দেশগুলোতে খুব ডিপ-রুটেড।

দীপেশ চক্রবর্তী : এটার জন্য তো আমাদেরও একটা দায়িত্ব আছে। আমরা তো সেই ভ্যালুজগুলোকে আনিক্রিটিক্যালি গ্রহণ করেছি। ঐতিহাসিকভাবে আমাদের নেতারা, আমাদের যারা আধুনিকতা চাইসে তারা তাদেরটাই গ্রহণ করসে।

শাহাদুজ্জামান : আমি সে কথাই বলছি। তবে এটাও তো ঠিক যে, এর বিকল্প মডেলটা ফরমুলেট করাটাও কঠিন।

দীপেশ চক্রবর্তী : এর মধ্যে এম্পায়ারের ইতিহাস আসে। পৃথিবীর এক কোণায় একদল লোক অন্যের জমিজমা লুটপাট করে খুব ভালো করে থাকতে শুরু করলো। ওদের ঐ জীবনযাপন দেখে পৃথিবীর অন্য কোনার লোকেরা ভাবা

~ www.amarboi.com ~

শুরু করলো, আমরাও বা কেন ওদের মতো থাকতে পারবো না। ওরাও বোঝালো, হ্যাঁ, তোমরাও পারবে। এজন্য সাম্রাজ্যের দরকার নেই, ডেভেলপমেন্ট করলেই হবে। ডেভেলপমেন্টের কতোগুলো মডেল ওরা দিলো। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হলোই তো এই কারণে। জার্মানি আর জাপান ভাবলো যে, তোমরা তো আমাদের জন্য সাম্রাজ্যের জায়গা রাখো নাই। লড়াই করে সাম্রাজ্য করতে হবে। সাম্রাজ্য না করলে আমরা তোমাদের মতো হতে পারবো না। ফলে হিটলার গিয়ে আক্রমণ করলো। তারপর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে তারা বললো যে, না না, সাম্রাজ্যের দরকার নেই, ডেভেলপমেন্ট করলেই হবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, ওরা জনপ্রতি যে পরিমাণ জমি নিয়ে ওভারঅল এই ব্যবস্থাটা করসে, বাকি পৃথিবীর মানুষের তো সেই পরিমাণ জমি এভেইলেবল না। এবং আমাদের ক্ষমতাও নাই যে, সেই পরিমাণ জমি ওদের কাছ থেকে কেড়ে নিবো। ফলে, আমরা এখন কখনো রিফিউজি হিসেবে আসি, কখনো মাইগ্রান্ট হিসেবে আসি। আমরা এখন মনে মনে বলছি তোমরা এবার জনসংখ্যা রিডিস্ট্রিবিউট কর। কিন্তু তা কীভাবে বলবো? ওরা এখন আইন-টাইন করছে যে লিগ্যালি কতো লোক আসবে ওদের দেশে। ফলে আমরা নৌকা চেপে চলে আসি।

শাহাদুজ্জামান : এখন যে পৃথিবী দাঁড়িয়েছে, তাতে এই ডিসপ্লেসমেন্ট তো বাড়তেই থাকবে। এই যে ধরেন, রোহিঙ্গা একটা বিরাট ডিসেপ্লেসমেন্ট।

দীপেশ চক্রবর্তী : হ্যাঁ, এগুলো আরো বাড়বে। এরাও অস্ত্রশস্ত্র বেশি তৈরি করবে যেন বাইরের লোক ঢুকতে না পারে। ভেবে দেখেন একদল হার্মাদ লোক, মেইনলি মারপিট করে, টেকনোলজি বানায়ে, অনেক লোকের জমিজমা দখল করে নিয়েছে। ধরেন ইউরোপ যদি এই কানাডা, ল্যাটিন আমেরিকা, ইউ এস এ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডের এই বিশাল জমি যদি না পাইতো, তাদের লক্ষ লক্ষ লোকরে ঐসব জায়গায় না পাঠাইতো তাইলে এতদিনে জনসংখ্যার চাপে ইউরোপের লোকজনের অবস্থা খারাপ হয়ে যেতো। এদের শহরগুলো বেঙ্গালুরুর মতো হয়ে যেতো। ওরা তো ওদের বিশাল প্রব্লেম সলভ করসে এভাবে। এম্পায়ার দিয়ে। আমাদের তো সে উপায় নাই। বাংলাদেশের যে জনসংখ্যা, আমরা লেবার পাঠাই মিডল ইস্টে, কোনোমতে। আপনাকে বলছিলাম না, এথেন্সের রাস্তায় এক বাংলাদেশি আমাকে বলে আমরা তো ব্ল্যাকে এখানে আসছি, আপনি কীভাবে আসছেন? আমি বললাম—আমি তো কনফারেন্সে আসছি। তো তারা বিশেষ বোঝে নাই ব্যাপারটা। আমার খুব মজা লেগেছে ব্ল্যাকের এই ব্যবহার। ব্ল্যাকে সিনেমার টিকিট কাটা যায়, ব্ল্যাকে ইতালিতে চলেও আসা যায়।

শাহাদুজ্জামান : ইন্টারেষ্টিং। এখন আমরা তো আর ঐ জমি দখল করতে পারবো না। ফাইট দিতে হবে কনসেপ্টের জায়গায়, আইডিয়ার জায়গায়।

~ www.amarboi.com ~

দীপেশ চক্রবর্তী : মুশকিল হলো, এই ডেভেলপমেন্ট মডেলের ভেতর থেকে এই ফাইটটা করা কঠিন। গান্ধী যেমন এই ডেভেলেপমেন্ট মডেলটাতেই বিশ্বাস করতেন না। তিনি এমনকি এ-ও বিশ্বাস করতেন না যে, সব বাচ্চা বাঁচতে হবে। একটা গল্প আছে গান্ধীর আশ্রমে। গান্ধী তো টিকায় বিশ্বাস করতেন না, ভ্যাকসিনে বিশ্বাস করতেন না। গান্ধী মনে করতেন, অসুখ হয় মানুষের লোভে। মানুষ যদি লোভ সংবরণ করতে পারে তবে অসুখ সেরে যাবে। ফলে টিকার কথায় বিশ্বাস করতেন না। এক সময় আশ্রমে বসন্ত এসে গেছে। তখন তিনটা বাচ্চা মারা গেছে। গান্ধীকে এসে লোকজন বলছে, মহাত্মাজী, এইবার আপনি টিকার ব্যবস্থা করেন। বাচ্চা মারা যাচ্ছে, বড়রা মারা গেলে একরকম। খুব চাপ আসছিলো চারদিক থেকে। গান্ধী তখন বলছেন, আমি বুঝতে পারলাম, ভগবান আমার বিশ্বাসের একটা টেস্ট নিচ্ছে। আমি তাদের বললাম, না। তোমরা যদি সবাই চাও ঠিক আছে, কিন্তু আমি টিকা পছন্দ করি না। ফলে ওর বিশ্বাসের কাছে একটা বাচ্চার প্রাণ কম মূল্যবান ছিলো। তার সেই বিশ্বাস ছিলো। আমাদের বেশিরভাগের এই বিশ্বাস নাই। বিশ্বাস নিয়ে গপ্পো আছে। বিশ্বাস কি জিনিস? এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর তার গোয়ালিনী। গোয়ালিনী দুধ আনে কিন্তু রোজ দেরি করে আসে। ব্রাহ্মণ বলে, তুই এতো দেরি করে আসলি কেন? গোয়ালিনী বলে, এই তো পণ্ডিতমশাই ঘাটে এসে দেখি মাঝি নাই, বসে থাকতে হলো। তারপরে মাঝি এসে ধরাধরি করে, এইসবে দেরী হয়ে যায়। তো গোয়ালিনী একদিন দুধ নিয়ে ঠিক সময় চলে আসছে। পণ্ডিত বলে, আজ কীভাবে আসলি? গোয়ালিনী বলে, তুমি তো আসতে বললে, কিন্তু সময়মতো কীভাবে আসতে হবে বলো নাই, ভাগ্যিস সেদিন শুনে ফেলছি। ব্রাহ্মণ বলে কি শুনেছিস? কীভাবে? গোয়ালিনী তখন বলে-তুমি একদিন কাকে বলছিলে, বিশ্বাস থাকলে হেঁটেও নদী পার হওয়া যায়। তারপর তো আমি হেঁটে নদী পার হয়ে এসেছি আজ। ব্রাহ্মণ বলে, বলিস কী? তুই নদীর উপর দিয়ে হেঁটে চলে আসলি? দেখাতে পারবি আমাকে? গোয়ালিনী বলে—হ্যাঁ, চলো না। তারপর ব্রাহ্মণ গেছে তার সাথে। ব্রাহ্মণ তো জলে নামে আর ধুতি তোলে। কিন্তু গোয়ালিনী তো ওদিকে নদীর উপর দিয়ে হাঁটা দিছে সোজা পথ দিয়ে। ব্রাহ্মণ বলছে ঠিকই, কিন্তু তার তো বিশ্বাস নাই, গোয়ালিনীর আছে। এটা গপ্পো। কিন্তু গান্ধীর এরকম বিশ্বাস ছিলো। আমি যেভাবে বড় হইসি তাতে আমি গান্ধীর মতো বলতে পারি না—বাচ্চা মারা গেছে ঠিক আছে। আমি নিজেই তো ডিপথেরিয়াতে মারা যেতাম ছোটবয়সে যদি সিরাম না থাকতো। তার ফলে আমি যে বাকি জীবন পাইসি তা এঞ্জয় করছি। তাহলে আমি কোন-মুখে আরেকজনকে বলি যে, তোর বাচ্চা মারা যাক। এইটা বলতে গেলে, এই ডেভেলপমেন্ট মডেলের বিরুদ্ধে যে গভীর প্রতীতি, গভীর প্রত্যয়ভাব সেইটা গান্ধীর ছিলো। গান্ধী উইয়ার্ড লোক ছিলেন। তার সেই মনের জোর ছিলো।

~ www.amarboi.com ~

শাহাদুজ্জামান : এখন তার ঐ বিশ্বাসটা কতোটা সত্য, এপ্লিকেবল—সেটা অবশ্য আরেক প্রশ্ন।

দীপেশ চক্রবর্তী : বিশ্বাসটা সায়েন্টিফিক্যালি সত্য কিনা সেটা আলাদা বিষয়। ধরেন, আমার বয়স ৭৫। হঠাৎ হার্টের প্রব্লেম হইলো। কি করবো? চিকিৎসা তো করতেই হবে। আমরা বুঝতে পারতেসি এই ডেভেলপমেন্ট মডেল সবার জন্য না। কিন্তু আমরা কতোটুকু এফর্ড করতে পারি এটা এনডোর্স না করতে?

শাহাদুজ্জামান : আমাদের কাছে বিকল্পও তো বিশেষ নাই। ডেভেলপমেন্ট মডেলের বাইরে য়াওয়ার চেষ্টাও তো বিশেষ হয় নাই।

দীপেশ চক্রবর্তী : গান্ধী তো ভাবতেন বিকল্প আছে। উনি তার আশ্রমটাকে ঐভাবে বানাবার চেষ্টা করছিলেন। তার কথা হলো লোভ সংবরণ করবো। নিজের বলে কিছু রাখবো না। উনি কোন প্রাইভেট সম্পত্তি করেন নাই। তার বড় ছেলেটা তো পাগল হয়ে গেলো। নেশাখোর হয়ে গেলো। একসময় মুসলমান হয়ে গেলো। বললো আমার বাবা আমাকে দেখে না। যেমন দক্ষিণ আফ্রিকার গুজরাটি ব্যবসায়ীরা গান্ধীকে বলে, তোমার আশ্রম থেকে ছেলেপেলে বিলাত পাঠাও, আমরা পয়সা দিবো। তার বড় ছেলের খুব ইচ্ছা ছিলো বাপ তাকে বিলাত পাঠায়। কিন্তু গান্ধী অন্য ছেলেকে পাঠালেন।

শাহাদুজ্জামান : গান্ধীর ছেলেকে নিয়ে তো একটা ফিল্ম আছে।

দীপেশ চক্রবর্তী : হ্যাঁ, গান্ধী ভাবতেন, প্রাইভেট, পার্সোনাল বলে কিছু নাই। আমার ছেলে অন্যের ছেলের চেয়ে বেশি ইম্পোর্টেন্ট না। তার ফলে ছেলেটার তো মাথা খারাপ হয়ে গেলো। এখন, এই প্রাইস দিতে তো আমরা বেশিরভাগই রাজি না। তাহলে আমরা পার্শিয়ালি উইলিংলি বট ইন্টু দিস ডেভেলপমেন্ট ইমাজিনেশন। আমরা সামহাউ ঐ ডেভেলেপমেন্ট মডেলটা বাই করেছি বলেই আমরা পাশ্চাত্যে থাকি, আপনিও পাশ্চাত্যে থাকেন।

শাহাদুজ্জামান : এটা তো মানুষ হিসেবে আমাদের এসপিরেশন আর ইমাজিনেশনের জায়গায় ফাইট করার একটা ব্যাপার। সেটা তো আলাদা একটা ফ্রন্ট। অনেক বড় ফাইট।

দীপেশ চক্রবর্তী : সত্যি আলাদা ফ্রন্ট সেটা এবং বড় ফাইট।

শাহাদুজ্জামান : এখন এসপিরেশনের লোকালাইজেশনের কথা বলতে গেলে তো নানা রকম কনট্রাডিকশনও তৈরি হয়। খুব ক্রুড একটা উদাহরণ দিই। ধরেন, নর্থ কোরিয়া যে ফর্মে স্টেটটা তৈরি করেছে সেটাকে আমরা কীভাবে দেখবো। বলবো যে সেটা ওদের জন্য ভালো? বলবো ওরা ওদের স্থানীয় এসপিরেশন অনুযায়ী একটা বিকল্প সমাজ তৈরী করেছে? বাইরে থেকে যেসব খবর পাওয়া যায় তাতে সেই দেশটাকে উইয়ার্ড মনে হতে পারে।

~ www.amarboi.com ~

দীপেশ চক্রবর্তী : লোকে বলে ওখানে খরা হয়, স্লেভ লেবার হয়। সত্য মিথ্যা তো জানি না। নর্থ কোরিয়া সম্পর্কে তো ভালো খবর বের হয় না। এবং সমস্ত মিডিয়া নর্থ কোরিয়াকে এমনভাবে দেখায় শুনলে মনে হয় ওটা ইডিয়টের দেশ। ওরা যে কি ভাবে সেটা বোঝা তো সম্ভব না। মিডিয়া যেভাবে দেখায় দে লুক লাইক বাফুনস। ওয়েস্টার্ন মিডিয়া ইরাক নিয়েও করতো ইরাক যুদ্ধের আগে। ইরাক সম্পর্কে শুনলে মনে হতো এটা বাফুনের দেশ। আমরা তো ভালোভাবে ওদের জানবার সুযোগ পাই না। সেটা ভিন্ন ব্যাপার। কিন্তু কথা হচ্ছে আমাদের ক্রিটিকগুলার মুশকিল হয় যে, আমরা তো গান্ধীর মতো না। আমরা এই ডেভেলপমেনট মডেলটাকে রিজেক্ট করতে পারিনি। এগুলা আমরা বুঝতে পারি বুদ্ধি দিয়ে যে এই মডেলটা সার্বজনীন হইতে পারে না। কারণ, এই মডেলটার পেছনে আছে এম্পায়ার। পৃথিবীব্যাপী ঐ এতখানি জমি যদি ওরা না নিতো, কিচ্ছু করতে পারতো না।

শাহাদুজ্জামান : জমি এবং রিসোর্স।

দীপেশ চক্রবর্তী : জমি আসছে বলেই তো রিসোর্স আসছে।

শাহাদুজ্জামান : তা তো ঠিকই। আমি ইউকের হিস্টরির কথা ভাবি। এই যে সব বড় বড় ক্যাসল এগুলা আসলো কোত্থেকে?

দীপেশ চক্রবর্তী : অক্সফোর্ড ক্যাম্ব্রিজের এই যে গথিক চেহারা, এগুলো টি-ট্রেডের পয়সা থেকে হইসে আর অপিয়াম ট্রেডের পয়সা থেকে। এসব দিয়ে নতুন গথিক শহর বানাইসে তারা।

শাহাদুজ্জামান : এবং লন্ডনের এই যে সব স্ট্রাকচার...

দীপেশ চক্রবর্তী : এইসব শহর তো এম্পায়ারের ইতিহাসে ভরা। আমার কথা হচ্ছে, ওরা আমাদেরকে বুঝাইসে যে, দেখো, এই যে উন্নতি আমরা বলি, এইটা কিন্তু এম্পায়ার না কইরাও করা যায়। চোখের সামনে উদাহরণ হিসেবে দেখবে—জাপান, ইউরোপের কিছু কিছু দেশ হইসে। কিন্তু আসলে এসব দেশের জনসংখ্যা ছিলো ছোট। কিন্তু আমরা তো সেইভাবে পারবো না, আমাদের যে জনসংখ্যা তাতে তো সেটা সম্ভব না। আজকে সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা চীন ও আমার দেশ ভারত-এ। অত কোটি লোকের মানে ১২৫ কোটি লোকের যদি এই পরিমাণ পার-ক্যাপিটা জমি লাগে, তাহলে চারটা প্ল্যানেট লাগবে। সেই কথাই বলছিলাম একটু আগে। আপনি যখন আমেরিকার মতো কমফোর্ট পাইলেন, কিন্তু আপনি দেশের শহরে থাকেন সেটা তো ঘিঞ্জি হয়ে বসে আছে। এই পরিমাণ ফাঁকা তো পাবেন না।

শাহাদুজ্জামান : যদি না অন্য জায়গা রিডিস্ট্রিবিউট করতে পারি।

দীপেশ চক্রবর্তী : তাহলে আমাদের রিডিস্ট্রিবিউট করার উপায়টা কি? লেবার এক্সপোর্ট স্কিল্ড লেবার, আনস্কিল্ড লেবার, মাইগ্রেশন, রিফিউজি। এছাড়া তো কোনো উপায় নাই। আমি বলতে চাচ্ছি—পার-ক্যাপিটা দেখলে

~ www.amarboi.com ~

ওরা যে পরিমাণ জমি পেয়ে এই ডেভেলপমেন্ট মডেলটা তুলে ধরেছে আমাদের তো তা নাই।

শাহাদুজ্জামান : কিন্তু সেই জমি, রিসোর্স তো আমরা পাবো না।

দীপেশ চক্রবর্তী : না পাবো না তো। সেটাই বলছি। তাহলে আপনার আমার সমস্যা কি? একদিকে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি বট ইনটু দ্য সিস্টেম, এটার এখন পুরাপুরি ক্রিটিক করতে গেলে আমার নিজের জীবনটাকে কনট্রাডিক্ট করতে হয়। গান্ধী এই কনট্রাডিকশন এভয়েড করতেই কেটে পড়েছিলেন। আগেই তিনি কাপড়চোপড় ছেড়ে ঐ রাস্তা বেছে নিয়েছেন।

শাহাদুজ্জামান : তিনি তার ভয়েসটা তৈরি করার জন্যই তো এই বিশেষ লাইফস্টাইল বেছে নিয়েছিলেন।

দীপেশ : একবার আশিষ নন্দী কোন এক সেমিনারে গান্ধীকে নিয়ে লেকচার করছিলেন। সেই সেমিনারে এক প্রফেসর ছিলেন। তিনি খুব চটেছিলেন, মার্ক্সিস্ট লোক। তিনি আশিষদাকে প্রশ্ন করলেন, প্রফেসর নন্দী, তুমি তোমার বাচ্চার অসুখ হলে কি মডার্ন হাসপাতলে নিয়ে যাও? আশীস দা বললো : নিয়ে যাই, টু পারমিট মাই এংগুইশ। আপনার আমার ক্রিটিকটা এংগুইশের মতো। আমরা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারি, কিন্তু সেটা পুরো লাইফস্টাইলে এডাপ্ট করতে পারি না। গান্ধী পেরেছেন।

শাহাদুজ্জামান : আপনি তো এও বলেছেন যে ইউরোপীয় ভাবনাগুলো এসেনশিয়াল কিন্তু ইনএডিকুয়েট।

দীপেশ চক্রবর্তী : হ্যাঁ, আমি তো মনে করি এসেনশিয়াল সেজন্যই তো আমরা নিজেরাই এটা নিসি। আমি যদি গান্ধীর মতো হইতে পারতাম তাইলে বলতাম এসেনশিয়ালও না। কিন্তু গান্ধীর সাহস কত লোকের হয়? সে তো পাগলা লোক ছিলো।

শাহাদুজ্জামান : কিন্তু আজকের এই গ্লোবালাইজড, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেটের এই পৃথিবীতে গান্ধীর ঐ লাইফস্টাইল এডাপ্ট করা কতোটা সম্ভব?

দীপেশ চক্রবর্তী : গান্ধীর বিভিন্ন লেখা পড়লে বুঝা যায়, তিনি নিজেকে খুব কঠিন করেছিলেন। মানে, আমি আমার বাচ্চার দিকেও দেখবো না। আমার তো সবচেয়ে কঠিন লাগে এ ব্যাপারটা।

শাহাদুজ্জামান : একটা অদ্ভুত স্ট্যান্ড।

দীপেশ চক্রবর্তী : উনি কিন্তু সেটা করতে পারতেন। উনি মনে করতেন যে, এই সো-কল্ড প্রাইভেট প্রপার্টি এবং প্রাইভেট ফ্যামিলি দুটাই খারাপ। উনি এই দুটারই বাইরে আসতে চেয়েছেন।

শাহাদুজ্জামান : এঙ্গেলসের কথাও তো ছিলো সেটা।

দীপেশ চক্রবর্তী : হ্যাঁ, কিন্তু গান্ধী তার জীবনে তা প্র্যাকটিস করলেন। উনি ঠিক করলেন যে, আমি আশ্রমে থাকবো সবাইরে নিয়ে। কেমন? উনি আশ্রমের

~ www.amarboi.com ~

লোকেদের বিয়েশাদির মধ্যেও ইন্টারফেয়ার করতেন। একটা মেয়েকে বড় করছিলেন গান্ধী। তার পিরিয়ড হলো কি হলো না সবকিছুতে গান্ধী ইন্টারেস্টেড ছিলেন। সেই মেয়ে পরে একটা বই লিখছে যে, 'বাপু মাই মাদার' বইলা।

শাহাদুজ্জামান : গান্ধীর ভাবনায় কি স্টেট ছিলো?

দীপেশ চক্রবর্তী : না। গান্ধী স্টেট নিয়ে ভাবতেন না।

শাহাদুজ্জামান : কিন্তু উনি তো ইন্ডিয়াকে স্টেট হিসেবেই দেখতে চাইতেন না কি?

দীপেশ চক্রবর্তী : এগুলো সব উনি প্র্যাগমেটিকেলি ভাবতেন। তার আলটিমেট গোল স্টেট নিয়ে ছিলো না। কিন্তু উনি জানতেন যে, তার এই স্টেটের পথ দিয়েই যেতে হবে। সেজন্য উনি তো স্বাধীনতার পর বলেছিলেন যে কংগ্রেস পার্টিটা উঠায় দাও। এখন তো স্বাধীনতা হয়ে গেছে আর পার্টির দরকার নাই। গান্ধীর অনেক কনট্রাডিকশন ছিলো। কিন্তু দেখেন, যখন স্বাধীন হলো দুইটা দেশ, তখন পাকিস্তানের ইন্ডিয়ার কাছে কিছু টাকা প্রাপ্য ছিলো। যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার ভারত সরকারের কাছে ঋণবদ্ধ ছিলো। ঋণের টাকাটা তারা ফেরত দিয়েছিলো দিল্লীকে। যেহেতু দেশ তখন ভাগ হয়েছিলো তাই পাকিস্তানের কিছু প্রাপ্য ছিলো। ইন্ডিয়া দিতে চাইছিলো না। তখন গান্ধী অনশন করলেন। আমৃত্যু অনশন। বললেন—এই টাকা পাকিস্তানকে দিতে হবে। এ এক অন্য রকমের লোক।

শাহাদুজ্জামান : উনি তো স্বাধীনতার দিন সেলিব্রেট করতে যানও নাই। চুপচাপ বাসায় বসেছিলেন।

দীপেশ চক্রবর্তী : উনি তো এই-রকম স্বাধীনতা চানই নাই। উনি তো চাননি পাকিস্তান হোক। কিন্তু যখন হয়ে গেছে, তখন উনি গিয়ে আমৃত্যু অনশন করতেসেন পাকিস্তানকে পয়সা দিতে হবে এই দাবি নিয়ে। গান্ধী অদ্ভুত লোক্।

শাহাদুজ্জামান : ওয়েস্টার্ন আইডিয়ার ক্রিটিক হিসেবে গান্ধী তো রেলেভেন্ট। ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেসন নিয়ে এক সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করলে গান্ধী ঠাট্টা করে বলেছিলেন-'ইট উড বি এ গুড আইডিয়া।'

দীপেশ চক্রবর্তী : হ্যাঁ। গান্ধী ভীষণরকম র‍্যাডিকেল ক্রিটিক। উনি বললেন —আমি তথাকথিত উন্নয়নে বিশ্বাস করি না। তার ফলে যে প্রাইস দিতে হয় আমি দিবো। এই উন্নয়ন না মানলে আমার লোক যদি মারাও যায় তাতে আমার আপত্তি নাই।

শাহাদুজ্জামান : গান্ধী কি ওয়েস্টার্ন সভ্যতার কিছুই নিতে রাজি ছিলেন না?

দীপেশ চক্রবর্তী : তিনি পশ্চিমাদের একাউন্টেবিলিটি খুব পছন্দ করতেন। উনি এক পয়সার হিসাবও দিতেন। তার তো রিচুয়াল ছিলো। তাকে টাকা পয়সা দিতো সব বড়-লোক, বিড়লারা। কিন্তু শেষ বয়স পর্যন্ত পাই পাই হিসাব দিছেন উনি। গান্ধী হিসাব কইরা দিতো, বিড়লারা সেই হিসাবের কাগজ পুইড়া

~ www.amarboi.com ~

ফেলতো। কিন্তু উনি তো মনে করতেন আমার প্রাইভেট কিছু নাই। প্রাইভেট কিছু নাই বলে সকলের সামনে কাপড় খুলে স্নান করতেন, দরজা খুলে রেখে ঘুমাইতেন। আমি এজন্য বলছি যে, আমাদের কন্ট্রাডিকশনটা কি? আমরা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারি যে, এই সভ্যতা সবার জন্য হতে পারে না। কিন্তু জীবনে এই সভ্যতার সুবিধা নিয়ে নিছি। বিশ্বাস করে নিয়েছি। তাই প্রভিনশিয়ালিজিং এ আমাকে বলতে হয়, ইনডিসপেন্সিবল কিন্তু ইনেডিকোয়েট। গান্ধী হলে ইনেডিকোয়েটই ছেড়ে দিতো। আপনি নিজে বিশ্বাস করেন না করেন, গান্ধী এমন এক লোক ছিলো যার জীবন এবং ভাবনা আলোকিত করে। আমরা খুবই ভালো বুঝি যে, পশ্চিমারা যে ভ্যালুজগুলো তৈরি করতেসে তার ভিতরে উন্নয়ন ধরা আছে, রাষ্ট্র ধরা আছে, ক্যাপিটালিজম ধরা আছে। গান্ধী ঐ উন্নয়ন রিজেক্ট করছেন। গান্ধী একজন উইয়ার্ড লোক। বিধাতা ওরকম আর দুইটা করেন নাই।

শাহাদুজ্জামান : এটা ঠিক—আমরা ওয়েষ্টকে ক্রিটিক করছি কিন্তু ওয়েষ্টার্ন সিভিলাইজেশনের অনেক কমফোর্টকে নিচ্ছি। গান্ধীর মতো রিজেক্ট করতে পারছি না। আমাদের এই অবস্থানের ভেতর ইনহেরেন্ট একটা কন্ট্রাডিকশন যেমন আছে আবার এটাও ঠিক যে, মনের ভেতর একটা গভীর অসন্তোষ আছে। আমরা তো ভেতরে থেকে ফাইট করছি। আমরা তো বগল বাজিয়ে সেটা করছি না। যেটা বললেন যে এর ভেতর একটা এ্যাংগুইস আছে।

দীপেশ চক্রবর্তী : হ্যা ঐ অ্যাংগুইস, ঐ কন্ট্রাডিকশনের মধ্যেই আলটিমেটলি একটা ভিশন আছে। একটা বাতায়ন পাতা আছে যেখানে আরেকটা ভবিষ্যত বসে আছে। আমি আমার এই কন্ট্রাডিকশন একনোলেজ করেই মডার্নিটি নিয়ে প্রশ্নটা তুলছি। তা না হলে তো আমি একটা মিথ্যা গান্ধী হওয়ার চেষ্টা করবো। আজকে সত্য গান্ধী হওয়ার সাহস নাই, কন্ভিশনও নাই। তাহলে আমাদের নিজেদের দুর্বলতা (কোট, আনকোট) মেনে নিয়েই কথা বলতে হবে।

শাহাদুজ্জামান : আর এটাও তো ঠিক পৃথিবীটা এখন যে চেহারাটা নিচ্ছে, এই চেহারাটা আগে কখনোই ছিলো না। ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডের যে বিরাট ইমপ্যাক্ট তা পৃথিবীতে তো আগে ছিলো না। তারপর ধরেন ক্লাইমেট চেঞ্জ। নতুন নতুন কন্ট্রাডিকশন তৈরী হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এটা তো গান্ধীর পৃথিবী না।

দীপেশ চক্রবর্তী : আপনি ক্লাইমেট চেঞ্জের কথা বললেন। একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস বলি। সমুদ্র তো উঠতেসে, প্যাসিফিক আইল্যান্ড ডুবতেসে, দ্বীপ ডুবতেসে, জমি ডুবতেসে, ফলে আগে কি ছিলো, কত মাইল আপনার জমি? এখন বলতেসে, আমার নেশনটা সমুদ্র দিয়ে মাপতে হবে। কারণ জমি কমে গেছে। ফলে জমির ইকুইভ্যালেন্ট মাছ হবে। কোস্টাল ওয়াটার থাকবে না। একটা আইল্যান্ড, তার সমুদ্রকে বলতে হবে 'নেশন'।

শাহাদুজ্জামান : ও আচ্ছা। এখন সমুদ্রটাও তার নেশনের অংশ? দেশের সমুদ্রসীমা না বরং দেশ ইটসেলফ?

~ www.amarboi.com ~

দীপেশ চক্রবর্তী : হ্যাঁ, বাউন্ডারি। তার মানে কি হলো, আমি জমির রিসোর্সগুলো পাইলাম না হারাইলাম, তাহলে এবার সমুদ্রে যে রিসোর্স আছে, মাছ আছে, সেগুলো আমার। সেখানেও সমস্যা, কারণ, সমুদ্র গরম হচ্ছে, মাছগুলো এখন অন্যদিকে দৌড় দিতেছে। আপনি ভাবছেন টুনা মাছ ধরবেন, সব মাছ দৌড় দিলো, মাছ ভাবলো এখানে আমার ডিম পাড়া ঠিক হবে না, অনেক গরম, আমি অন্যদিকে গিয়ে ডিম পাড়বো। সামনে হয়তো অনেক লোক হাউস-বোটে থাকবে। সমুদ্রটাকে তারা জমি ভাবতেসে। পৃথিবীটা এমন একটা জায়গায় আসতেসে, যেখানে কন্ট্রাডিকশনে কন্ট্রাডিকশনে সয়লাব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইউনাইটেড নেশনস হয়ে যে একটা সেটল্ড অর্ডার হলো, সেটা এখন একদম আনডান হচ্ছে। এটা একটা আনম্যানেজেবল পৃথিবী হয়ে যাচ্ছে।

শাহাদুজ্জামান : আপনি তো ক্লাইমেট চেঞ্জের উপর লিখছেন এখন। আপনার মূল আর্গুমেন্ট কি সেখানে?

দীপেশ চক্রবর্তী : আমরা এতো বেশি এই সিস্টেমে বাই-ইন-টু করসি যে, আমরা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারি ক্লাইমেট চেঞ্জে কি হচ্ছে, কি হবে, কিন্তু আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সব তো জড়ানো। যেমন আমি যে পেনশনের কথা ভাবি সেটা আমেরিকান স্টক-এর সাথে জড়িত। আপনি যখন ছেলেকে নিয়ে ভাববেন, তখন দেখবেন যে, গত ২০-৩০ বছর কোনো ক্যারিয়ার ভালো হয়, সে যেন সেটা পড়ে। ফলে, আমরা যে সময়ে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করি, সেইটাতো ক্যাপিটালিজমের ইতিহাসে পায়, গ্লোবালাইজেশনে পায়। গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর সাথে আমাদের জীবনের আসপিরেশনের ব্যাপার জড়িত। গ্লোবাল ওয়ার্মিং এখনো বুদ্ধির রাজ্যের জিনিস।

শাহাদুজ্জামান : মানে, ক্লাইমেট চেঞ্জের ইন্ডিভিজ্যুয়াল এপিলটা এখনো তৈরি হয়নি।

দীপেশ চক্রবর্তী : না, শুরু হয়েছে। নানান জায়গায় নানাভাবে শুরু হয়েছে। কান্টের একটা কথা আছে—মানুষ কীভাবে শেখে। একটা হলো, ডিজেস্টার। আমারো এটাই বক্তব্য যে, ক্লাইমেট চেঞ্জ আমাদের জন্য একটা প্রিডিকামেন্ট। এই কারণে, গত ৫০ বছরে গ্লোবালাইজেশনের যে ইতিহাস, আর ইভোলিউশন নিয়ে যতো থিওরি, এরকম একটা ক্রাইসিস ডিল করার জন্য আমরা প্রস্তুত না। আনফরচুনেটলি আমাদের মধ্যে এই প্রস্তুতিটা আসবে ক্রাইসিসের ভিতর দিয়ে।

শাহাদুজ্জামান : আমেরিকার মতো একটা দেশ, এর প্রেসিডেন্ট তো ক্লাইমেট চেঞ্জ একনোলেজই করে না।

দীপেশ চক্রবর্তী : এখনো ভাবতেসে বোকার মতো। কিন্তু ক্রাইসিসটা তো বাড়বে। তদ্দিনে অনেক দেরি হবে, মানুষের অনেক সর্বনাশ হবে। তার ভিতর দিয়ে যা হবার হবে।

~ www.amarboi.com ~

শাহাদুজ্জামান : কেউ কেউ বলে অন্য সব টেকনোলজি দিয়ে এসব ক্রাইসিস ম্যানেজ করে ফেলা যাবে।

দীপেশ চক্রবর্তী : সেটা ভাবে অনেক লোকে। কিন্তু ঐযে বললাম, যদি কার্বন বেড়ে, গাছগুলোর যদি কার্বোহাইড্রেট বেড়ে যায়। তাহলে কতো আর আপনি নতুন ব্রিজ তৈরি করবেন তার তো একটা গ্যাপ থাকবে সময়ের। এর মধ্যে যা ক্ষতি তা তো হয়ে যাবে। আমার এই প্রস্তাবটা খুবই ইন্টারেস্টিং লাগলো যে, আমার সীমানা হলো সমুদ্র। ফলে কোস্টাল ওয়াটারের কনসেপ্ট-টা নাই। পুরাটা দেশেরই কনসেপ্ট। দেশের কনসেপ্ট বদলাচ্ছে এখন। তারা সামুদ্রিক জীবের মতো হয়ে গেছে। এখন দেখছি, সমুদ্র আমাদের বেঁচে থাকার জায়গা।

শাহাদুজ্জামান : নোয়া হারারি নতুন পৃথিবীর চ্যালেঞ্জ নিয়ে লিখছেন। উনি তো বলতেছেন একসময় সুপ্রিম অথরিটি ছিলো গড, তারপর সুপ্রিম অথরিটি হয়ে উঠলো ইন্ডিভিজুয়াল, এখন সুপ্রিম অথরিটিটা হয়ে উঠছে ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড। ভবিষ্যত মানবজাতির জন্য এর তো নানা ইম্পলিকেশন আছে।

দীপেশ চক্রবর্তী : হারারির রিসেন্ট বইটা না তার 'সেপিয়েন্স' বেটার বই। এখন ধরেন আপনি যখন বাইসাইকেলে চড়তেন। ছোটখাট গোলমাল নিজেই ঠিক করা যেতো। এখন যা ব্যবহার করেন, তার চেয়ে আপনার নলেজ খুব ফ্র্যাগমেন্টারি। অন্য কেউ বেশি জানে। এরকম একটা সমাজ চালানো খুব মুশকিল। আপনি যখন বুড়া হবেন, আরো দুর্বল হয়ে যাবেন তখন আরো মুশকিল হয়ে যাবে। ফলে আপনাকে আরো অসহায় বানাবে। ফলে, এই যে সক্ষম হবার উপরে বিশেষ জোর দেয়া, আরো বাড়বে।

শাহাদুজ্জামান : এই পৃথিবীর বিকল্প ভাবা কঠিন ঠিকই, কিন্তু প্রশ্নগুলো তো তুলতে হবে।

দীপেশ চক্রবর্তী : হ্যাঁ। বিকল্প এমুহূর্তে স্পষ্ট হয় নাই বলে প্রশ্ন হবে না? এটা এমন একটা সময়, সুকুমার রায়ের কবিতাটা মনে আছে? খুড়োর কল? সেটা হচ্ছে যে, হেঁটে যেতে হবে, কিন্তু কি করে যাবো? মোটিভেট করবে কীভাবে? ছেলেটা তখন লাঠির গোড়ায় একটা চমচম বেঁধে দিয়েছে। চমচমটা এমন জায়গায় ঝোলায়ে দিসে, যে ধরা সম্ভব না। মানে হচ্ছে সে এটার কাছে যাইতে চাইতে চাইতে হেঁটে চলে যাবে। এইটা ডেভেলপমেন্টের মতো। আরেকটা গপ্পো আছে। ডেভেলপমেন্ট কারে কয়? দুইটা বাচ্চা দুধ খাইয়া আনন্দে লাফায়, আর বাকিরা ওরা যে আনন্দে লাফাচ্ছে ঐটা দেখেই লাফায়। এর নাম ডেভেলপমেন্ট।

শাহাদুজ্জামান : ছাগলের তিন নাম্বার বাচ্চা বলে একটা কথা আছে। এইটা দারুণ। এই যে বিকল্প ভাবনার কথা বলছি। আপনাকে বলি আমি আপনার প্রভিন্সিয়ালাইজিং ইউরোপ পড়ে মুভড হইছি, এই একটা বিকল্প ভাবনার নিশানা পেয়েই। এই যে থার্ড ওয়ার্ল্ডে থাকা তারপর ইউরোপে আসা, অভিজ্ঞতা থেকে

~ www.amarboi.com ~

বুঝি এই ইউরোপিয়ান লিবারেল মডার্নিটির যে ভিশন সেটা আমাদের ডেসটিনি না। আপনার বই থেকে আমি একটা ভিন্ন ভিশন পেয়েছি।

দীপেশ চক্রবর্তী : আমিও কিন্তু বইটা লিখেছি এক্সপেরিয়েন্স থেকে মটিভেটেড হয়েই। আমরা বড় হয়েছি অন্যরকম সমাজ জেনে, যার আশা-আকাঙ্ক্ষা অন্যরকম ছিলো। লিবারেল সমাজের মতোন ছিলো না। কিন্তু সেই সমাজের চিন্তাটা তাহলে কোথায় থাকবে আমাদের ভাবনা-চিন্তায়?

শাহাদুজ্জামান : এমন হলো যেন আমাদের সমাজের ভাবনাগুলো সব বোকা বোকা ভাবনা। সেগুলোর আর কোনো ভবিষ্যত নাই!

দীপেশ চক্রবর্তী : অনেকে বলবে এসব খুব নস্টালজিক ভাবনা। কিন্তু তারা আসলে ইন্ডিস্পেন্সিবল এবং ইনভিন্সিবল এই কথাটার মর্মার্থটা বুঝতে পারে না। আপনার দেশে বসে যা কিছু আপনি সুন্দর, রুচিশীল এবং সুকুমার জেনে বড় হইসেন, ইউরোপ আপনারে বলবে যে, এইসবের কোন মূল্য নাই।

শাহাদুজ্জামান : প্রভিনশিয়ালাইজিং ইউরোপ লিখতে গিয়ে আপনি বাংলার জনজীবন, সাহিত্য থেকে যেসব উদাহরণ ব্যবহার করেছেন সেগুলো এতো চেনা। থিয়োরিটিক্যাল আর্গুমেন্ট করতে গিয়ে আমাদের লিভড এক্সপেরিয়েন্সকে যেভাবে ব্যবহার করেছেন তা দারুণ উপভোগ করেছি। আমি তো কোন ইতিহাসের পণ্ডিত মানুষ না, কিন্তু আমি একদম উপন্যাসের মতো মজা পেয়ে বইটা পড়েছি। মনের কতো বন্ধ দরজা যে খুলে গেছে। বহু অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি। তৃতীয় বিশ্বের মানুষ হিসেবে মনের ভিতর নানারকম যে পাথর চেপে থাকে সেসব পাথর সরে গেছে।

দীপেশ : সত্যি বলতে প্রভিনশিয়ালাইজিং ইউরোপ তো আমার আত্মার প্রতিবাদ। আমার কেন জানি মনে হয় যে, অনেক সমালোচনা সত্ত্বেও এই বইটা থাকবে। আমি যখন এটা লিখসি তখন বুঝি নাই। কিন্তু এখন মনে হয় যে, এই বইটার একটা জান আছে।

আমার বই

~ www.amarboi.com ~

দীপেশ চক্রবর্তীর সাথে ই-মেইল বিনিময়

(দীপেশ চক্রবর্তীর সাথে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ের সূত্রপাত এক কৌতূহলোদ্দীপক ই-মেইলের মাধ্যমে। সেই সূত্রে তার সঙ্গে যোগাযোগ, দেখা সাক্ষাৎ, ঘনিষ্ঠতা। আমাদের সেই ই-মেইল বিনিময়ে অনানুষ্ঠানিকভাবে দীপেশ চক্রবর্তী তার নানা ভাবনার কথা জানিয়েছেন। এই ই-মেইলে ব্যক্তিগত দীপেশেরও নানা পরিচয় মেলে। মেইলগুলোতে দীপেশের চিন্তা বিষয়ে আমার নিজের নানা অনুভূতির কথা বলবারও সুযোগ হয়েছে।

২০১২ সালে আমি প্রথম দীপেশ দার কাছ থেকে একটি ই-মেইল পাই। আমার একটি বই পড়ে তিনি স্বতঃপ্রনোদিত হয়ে মেইলটি করেন। আমার বইয়ের প্রতিক্রিয়া হিসেবে আমি প্রায়ই চেনা-অচেনা অনেকের কাছ থেকে ই-মেইল পাই। আমি শুরুতে এই মেইলটিকে তেমনি দীপেশ চক্রবর্তী নামের কোনো এক পাঠকের প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করি। আমি মেইল-লেখকের প্রকৃত পরিচয় বুঝতে পারিনি। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ দীপেশ চক্রবর্তী এভাবে নিজে থেকে আমাকে ই-মেইল করবেন সেটা আমি মোটেও প্রত্যাশা করিনি। কিন্তু অচিরেই সেই ভুল ভাঙ্গে আমার। প্রথম কয়েকটি ই-মেইলে আমাদের সেই কৌতূহলোদ্দীপক পরিচয় পর্বের নমুনা আছে।

এরপর আনুষ্ঠানিকতার আড়াল থেকে বেরিয়ে তিনি হয়ে ওঠেন আমার দীপেশ দা। তার সাবঅলটার্ন তত্ত্ব, 'প্রভিন্সিয়ালাইজিং ইউরোপ' বই নিয়ে আলাপ হয় ই-মেইলে। তার সঙ্গে প্রথম দেখা হয় ২০১৫ সালে যখন তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করতে এসেছিলেন। এরপর ২০১৭-তে শিকাগোতে তার বাড়িতে অতিথি হয়ে যাই। চমৎকার সময় কাটে দীপেশ দা এবং তার স্ত্রী রোচনার সঙ্গে। একাডেমিক পরিচয়ের বাইরে দীপেশ দার একটি সঙ্গীত-শিল্পী পরিচয়ও আছে। দীপেশ দা পঞ্চাশ দশকে কলকাতায় 'অঙ্গীকার' নামে একটি চলচ্চিত্রে কিশোর শিল্পী হিসেবে গানও করেছেন। শিকাগোয় তার বাড়িতে বসে গানের আসর।

~ www.amarboi.com ~

আমার একাডেমিক লেখাপত্রে দীপেশ চক্রবর্তীর তত্ব আমি ব্যাবহার করেছি, সে বিষয়ে দীপেশ দা মন্তব্য করেছেন ই-মেইলে। তিনি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন শাহবাগ আন্দোলন বিষয়ে আমার বই নিয়ে এবং আমার উপন্যাস 'একজন কমলালেবু' নিয়েও। নতুন গ্রন্থ রচনা, নানা আন্তর্জাতিক সেমিনারে বক্তৃতা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাজে সারা বছর অত্যন্ত ব্যস্ত থাকা সত্বেও দীপেশ দা যে আমাকে মাঝে-মধ্যে ই-মেইল করেন, স্কাইপে কথা বলার সময় দেন সেজন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞতা। দীপেশ দার অনুমতিক্রমে আমাদের নির্বাচিত কিছু ই-মেইলের অংশ-বিশেষ এখানে পত্রস্থ করলাম।)

৯ নভেম্বর ২০১২

প্রিয়ভাজনেষু,
আমার হাইডেলবার্গবাসিনী বন্ধু-মালা আর ফারুক আমাকে এক কপি আপনার বই 'চিরকুট' সম্প্রতি পাঠিয়েছিলেন। নানান কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমি আপনার ছোট ছোট লেখাগুলি একটু একটু করে পড়ি, ও আপনার অনুভূতি ও আপনার সুন্দর প্রকাশে মুগ্ধ হই। আপনি আমাকে চিনবেন না। আমিও আপনার লেখার সঙ্গে পরিচিত ছিলাম না। কিন্তু মালা এই পরিচয় করানোতে ভালো লাগলো। দেশে বিদেশে আপনার মতো বাঙ্গালী এখনও আছেন জেনে মনে কিছুটা আশা ভরসা হয় আমাদের শতধা ও আত্মবিস্মৃত এই জাতিটির জন্য। আপনি আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহণ করবেন।
ইতি
দীপেশ চক্রবর্তী

৯ নভেম্বর ২০১২

দীপেশ চক্রবর্তী,
আপনার মেইলের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি আমার লেখা পড়েছেন এবং পছন্দ করেছেন জেনে খুশি হলাম। মালাদির সঙ্গে বেশ কিছুকাল যোগাযোগ নেই। তার প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা যে, তিনি আমার বই আপনাকে পাঠিয়েছেন। আমাদের জাতির যে আত্মবিস্মৃতির কথা বলছেন তা তো প্রতি মুহূর্তেই টের পাই। এইসব লেখা সেই গ্লানি মোকাবেলাই চেষ্টা মাত্র। আমি ফিকশন, ননফিকশন মিলিয়ে বেশ-কিছু বই লিখেছি। কখনো সুযোগ হলে পড়ে দেখবার অনুরোধ রইলো। আপনার পরিচয়টা জানতে পারলেও ভালো লাগতো। আপনি কোথায় আছেন এখন, হাইডেলবার্গেই কি?
শুভেচ্ছা,
শাহাদুজ্জামান

~ www.amarboi.com ~

১০ নভেম্বর ২০১২

শাহাদুজ্জামান,
আমার ব্যক্তিগত পরিচয় এই যে আমি মালার কলেজের বছরগুলোতে উনার সহপাঠী ছিলাম কলকাতায়। পেশায় মাষ্টার। ইতিহাস পড়াই শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে। আপনার অন্যান্য লেখা সুযোগ পেলে পড়বো নিশ্চয়ই।
শুভেচ্ছান্তে
দীপেশ

১০ নভেম্বর ২০১২

দীপেশ দা,
এবার আমি বুঝতে পাচ্ছি আপনি তবে সাব-অলটার্ন ষ্টাডিজের দীপেশ চক্রবর্তী। কি আশ্চর্য দেখুন আমি ভেবে উঠতেই পারিনি কারণ আপনার কাছ থেকে মেইল পাওয়া আমার জন্য খুবই অপ্রত্যাশিত একটি ব্যাপার। আপনি আমাকে লিখেছেন ভেবে ভীষণ ভালো লাগছে। আপনার নাম এবং কাজের সঙ্গে তো নানাভাবেই পরিচিত। অবাক ব্যাপার হচ্ছে, আমি সবে-মাত্র পড়ে শেষ করেছি আপনার, 'ইতিহাসের জনজীবন এবং অন্যান্য প্রবন্ধ' এবং পড়ে একটা বিশেষ ব্যাপারে আরো জানবার কৌতুহল হাচ্ছিলো, মনে মনে ভাবছিলাম আপনার সঙ্গে কিভাবেই বা যোগাযোগ হতে পারে। কি অদ্ভুত কাকতালীয়! আপনাকে যদি মাঝে মধ্যে লিখি উত্তর পাবো আশা করি।
আবারো কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ।
শাহাদুজ্জামান

১১ নভেম্বর ২০১২

শাহাদুজ্জামান,
আমি সেই উক্ত "দীপেশ-দা"-ই বটে! কিন্তু আপনি যে আমার কথা জানবেন, তা আমার কাছেও অপ্রত্যাশিত ছিলো। অবশ্যই লিখবেন। আমিও সাধ্যমতো জবাব দেবো। আপনার লেখা পড়ে আপনার মানসিকতার যে পরিচয় পেলাম তা আমার খুবই ভালো লেগেছে। আপনার অন্যান্য রচনা পড়ার সুযোগ হবে আশা করি। ভালো থাকবেন ও আমার সপ্রীতি শুভেচ্ছা জানবেন।
দীপেশদা

১১ নভেম্বর ২০১২

দীপেশ দা,
তৃতীয় বিশ্বে বসে সাহিত্য করার চেষ্টা করি, ফলে পোষ্ট কলোনিয়াল, সাব-অলটার্ন বিষয়ক ভাবনাচিন্তার খোঁজ-খবর অল্প-বিস্তর রাখতেই হয়। আর সে জগতে গেলে

~ www.amarboi.com ~

আপনাকে না চেনা কি সম্ভব? আমার নিজের আবার নানা বিষয়ে বেয়াড়া ধরনের কৌতুহল। পড়েছি মেডিসিনে, সেখান থেকে বেরিয়ে পিএইচডি করেছি নৃবিজ্ঞানে, আর করি সাহিত্য। ফলে আমার ডিসিপ্লিনারী পরিধি বেশ গোলমেলে। মূলত গল্প উপন্যাসই লিখি, তবে নন ফিকশনও বেশ কিছু আছে। ইতিহাস আমার প্রধান একটি আগ্রহের জায়গা। আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী রাজনীতির একটা বিশেষ জটিল এবং ধোঁয়াচ্ছন্ন কালপর্ব নিয়ে সম্প্রতি একটা ডকু-ফিকশন ধরনের বই লিখেছি যা নিয়ে বিস্তর তর্ক বিতর্ক হয়েছে দেশে। কখনো সময় সুযোগ হলে আমার বইগুলো আপনাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করবো। বর্তমানে আমি ব্রিটেনে নিউক্যাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছি, 'গ্লোবাল হেলথ' বিষয়ে। পশ্চিমা দেশে বসে দিনযাপন করতে গিয়ে ইতিহাস, আধুনিকতা, ঔপনিবেশিকতা বিষয়ক ভাবনাগুলো আরো বেশী তাড়িত করছে। আপনার সঙ্গে যখন ব্যাক্তিগত যোগযোগ ঘটলো এই সুযোগ নিয়ে মাঝে মাঝে আপনার দ্বারস্থ হবো, হয়তো কিছু অর্বাচিন প্রশ্ন নিয়ে। নিরাশ করবেন না ভরসা করছি।

আপাতত দুটো অনুরোধ, কোন পেপারের রেফারেন্স কি একটু দিতে পারেন যেখানে তৃতীয় বিশ্বের আধুনিকতা বা বিকল্প আধুনিকতা ভাবনাটির মুল প্রস্তাবনাগুলো এক জায়গায় পেতে পারি? আর অন্য অনুরোধটা একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে। আমার এক অনুজ বন্ধু বিপ্লব এবং যৌনতা এ বিষয়ে একটা কাজ করার চেষ্টা করছে, আমিও আছি ওর সঙ্গে। মুলত বিপ্লবীদের যৌন নৈতিকতার ইতিহাস, রাজনৈতিক আনুগত্য আর আবেগ কামনাগত আনুগত্যের দ্বন্দ্ব, বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে এর প্রভাব এসব দেখবার চেষ্টা করছে। সে বাংলাদেশের ইতিহাসে ব্যাপারটা দেখলেও পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রেক্ষিতে ব্যাপারটা দেখতেই হচ্ছে। আপনার 'এ কালচারাল হিস্ট্রি অব মাষ্টারবেশন' বিষয়ক লেখাটা পড়তে গিয়ে মনে হচ্ছিল আপনার কাছে জানতে চাইব ভারতীয় বিপ্লবীদের যৌনতা বিষয়ক কোন বই, লেখালেখির খোঁজ আপনি দিতে পারেন কিনা।

সুযোগ পেয়ে নানা রকম আবদার করে বসছি। কিছু মনে করবেন না। আপনার সময় সুযোগ মতো কখনো লিখলে খুশি হবো।

শুভ কামনায়,

জামান

১৬ নভেম্বর ২০১২

জামান,

আপনার দুটো প্রশ্নের উত্তরে জানাই: এক জায়গায় তৃতীয় বিশ্বের আধুনিকতা নিয়ে লেখা আছে, এমন প্রবন্ধের কথা এক্ষুনি মনে পড়ছে না, কিন্তু Peter Wagner-এর লেখা-পত্র দেখতে পারেন; দুই, বিপ্লবীদের যৌনতা বিষয়ে বই বিশেষ দেখিনি, কিন্তু সম্প্রতি প্রকাশিত শ্রীলা রায়ের নকশালপন্থীদের বিষয়ে

~ www.amarboi.com ~

রচিত বইতে এই নিয়ে আলোচনা আছে। শ্রীলা বিলেতেই কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান, ঠিক কোথায় এখন মনে পড়ছে না। এ ছাড়া তেলেঙ্গানা বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা নারীবাদী বই, We Were Making Revolution গ্রন্থেও কিছু আলোচনা ছিলো। স্মৃতি বিষয়ক রচনার ওপরেই আপনাকে মূলত নির্ভর করতে হবে।

শুভেচ্ছান্তে,
দীপেশদা

৩০ এপ্রিল ২০১৩

দীপেশ দা,
ভালো আছেন আশা করি। লিখছি এইটুকু জানাতে যে সম্প্রতি আমাদের নিউক্যাসল ইউনিভার্সিটিতে একটা সেমিনার হলো আপনার লেখাপত্রকে কেন্দ্র করে। স্বভাবতই আমি ছিলাম উৎসুক অংশগ্রহণকারী। প্রানবন্ত অনেক আলাপ হলো। জ্ঞানকাণ্ডে আপনার Provincializing Europe বইটার অবদান নিয়ে কথা বললেন বক্তারা। ব্যক্তিগতভাবে বইটা আমি পড়েছি সম্প্রতি। সত্যি বলতে বইটা আমার বহুদিনের বহু ভাবনার জট খুলে দিয়েছে। দাগিয়ে পড়তে শুরু করেছিলাম শেষে দেখলাম প্রায় প্রতিটা লাইন দাগাতে হচ্ছে আমাকে। বাতিল করলাম দাগাদাগি। খুবই তাড়িত আছি বইটা পড়বার পর থেকে। সেমিনারে এক বক্তা বলছিলেন, সাবঅলটার্নের 'নট ইয়েট' উপাদান ইউরোপের বহু জনপদের জন্যও প্রযোজ্য যেটা আপনার ঐ বইয়ে আলোচিত হয়নি। যা হোক এ নিয়ে তর্কে বিতর্কে চমৎকার একটি সন্ধ্যা কাটিয়েছি।
জানতে চাচ্ছিলাম সাবঅলটর্ন ধারণা প্রয়োগ করে হেলথ বা মেডিকেল সেক্টরে কি কাজ হয়েছে? আমি আপনাকে মেডিকেল এথিকস নিয়ে আমার যে লেখাটা পাঠিয়েছিলাম সে আলোচনাকে এই আলোকেও হয়তো দেখা যেতো। কিন্তু আমি তো মূলত রসকাণ্ডের মানুষ মাঝে মাঝে অক্ষমভাবে ঢুঁ মারি জ্ঞানকাণ্ডে।
আপনি কি আমেরিকায় ফিরেছেন?
শুভ কামনায়
জামান

৩০ এপ্রিল ২০১৩

জামান,
আপনার চিঠি পেয়ে ভালো লাগলো। আমি আমেরিকায় ফিরে এসেছি, যদিও আগামী ৩রা মে দিন দশেকের জন্য অস্ট্রেলিয়া যাবার কথা। একটু বেশি ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। আশা করছি সেপ্টেম্বর মাস থেকে স্বস্তি পাবো। ততদিনে বর্তমান ব্যস্ততার মূল কারণগুলি অপসৃত হবার কথা।

~ www.amarboi.com ~

আমার বইটা আপনার ভালো লেগেছে জেনে খুশি হলাম। কষ্ট করে পুরোটা পড়েছেন, এটা আমার সৌভাগ্য। খুব সহজপাঠ্য বই তো নয়। ইউরোপেও নিশ্চয়ই "not yet"-এর যুক্তি খাটে। বইটি লেখার পরে আমিও এ বিষয়ে বেশি করে অবহিত হয়েছি। এখনো অনেক গাল খাই বইটির জন্য, বিশেষত এক ধরনের মার্কসবাদীদের কাছ থেকে।

আপনার পাঠানো "গবেষণা" বিষয়ক লেখাটি পড়েছিলাম। অবশ্যই "সাবল্টার্ন হিস্ট্রি"র গল্প। আমাদের দেশে শিক্ষার প্রভেদ একই ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে যুগপত আত্মীয়তা ও দূরত্বের বোধের সূচনা করে; তার ওপর আপনাদের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের গবেষণা-পদ্ধতির কিছু নীতিগত দাবি ছিলো, সেগুলি নানান অসঙ্গতির সৃষ্টি করে হয়ত পাশ্চাত্যকেই "প্রভিনিশয়ালাইজ" করে। লেখাটি আমার ভালো লেগেছিলো।

আপনিও তো জ্ঞানমার্গেরই মানুষ—জ্ঞান আর রস কি আলাদা করা যায়? জ্ঞানের মধ্যেই রসের সন্ধান না-পেলে তো জ্ঞানের সাধনা করাও যায় না!

আপনি আমার বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানবেন।

ভালো থাকবেন—

দীপেশদা

১ লা মে ২০১৩

দীপেশ দা,

যে জ্ঞান আর রসের সমন্বয়ের কথা বলছিলেন আপনার বইটাতে আমি সেই সমন্বয় পেয়েছি বলে ওমন ঢাউস বইটা প্রায় গোগ্রাসে গিলেছি। অন্যান্য সাবঅলটার্ন পন্ডিতদের সব লেখায় তো দাঁত বসাতে পারিনি সবসময়। কিন্তু আপনার বইটার আয়োজন, ভাষা এত প্রাঞ্জল যে আমার জ্ঞানের নানা সীমাবদ্ধতা সত্বেও কেমন তরতরিয়ে এগিয়ে গেছি। আমার জন্য বইটা একটা ব্যাক্তিগত যাত্রা, উন্মোচনও ছিলো। ইউরোপে বহুদিন ধরে যাওয়া আসা করছি, ইউরোপীয় পন্ডিতদের লেখাপত্রও একটু আধটু পড়েছি কিন্তু সবসময় মনে খটকা লেগেছে এই কি সেই সমুজ্জল সমাজ যার পথে আমাদের সবাইকে যাত্রা করতে হবে? এই স্টেশনেই পৌঁছাতে হবে? আর কোন ট্রেন ধরবার উপায় নেই? কিন্তু পৃথিবীর যে প্রান্তে বসে এসব ভেবেছি সেখানে তো প্রগতি, উন্নয়ন, আধুনিকতা নিয়ে অবিরাম এক হীনমন্যতার জন্যই দেয়া হয়েছে। ইউরোপীয় ভাবনার প্রতি সব ঋণ স্বীকার করেও এই ভাবনার ইমারতের ইট, পাথর, সুড়কি যেভাবে আপনি এক এক করে খসিয়েছেন তা রুদ্ধশ্বাসে লক্ষ করেছি। বইটা পড়া শেষে বুক থেকে কেমন একটা পাথর যেন সরে গেছে। মনে হয়েছে বেশ তো পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার, স্বপ্ন দেখবার আরো তো কত উপায় আছে। আর বইটাতে ঘুরে-ফিরে আমাদের ওপারের যে উদাহরণগুলো এনেছেন সেগুলো এত চেনা, এত ঘরের কাছের যে

~ www.amarboi.com ~

সেটাও এক বাড়তি উত্তেজনা তৈরি করেছে। আর সাহিত্যের উদাহরণগুলো পড়তে গিয়ে তো মনে হয়েছে নিজের আত্মীয়-স্বজনের কথা পড়ছি। আড্ডা অংশটা দারুন আগ্রহে পড়েছি। নিজেদের আড্ডার নষ্টালজিয়ার চলে গেছি। জীবনানন্দের 'মজলিস' বলে একটা গল্প আছে, সেটা পড়া আছে কি আপনার?
আপনার লেখা নিয়ে মার্ক্সবাদীদের সমালোচনার জায়গাগুলোও জানতে ইচ্ছা হয়। এক জায়গায় দেখলাম স্লাভো যিযেক আপনার কোন একটা প্রস্তাব বিষয়ে দ্বিমত করছেন।
যাহোক, মেডিকেল ক্ষেত্রে সাবঅলটার্ন আলোকে কাজ করবার ইচ্ছা জাগে। গবেষণা নিয়ে আমার লেখাটা ভালো লেগেছে জেনে খুশি হলাম। ডেভিড সাহেবের কাজকর্মের খোঁজ নিলাম। পড়বো আশা করছি। আপনার কাছে পরামর্শের জন্য লিখে হয়তো বিরক্ত করবো মাঝে মাঝে। আমার নিজের প্রণোদনা অবশ্য কাজ করে মৌলিক সাহিত্য রচনাতে বেশী, ফলে নিজেকে রসকাণ্ডের মানুষ ভাবতে পছন্দ করি। এছাড়া বাংলাদেশের একটা প্রধান দৈনিকে নিয়মিত কলাম লিখি। বাংলাদেশে এমুহূর্তে নানা চড়াই উৎরাই চলছে, সেগুলো নিয়ে লিখছি।
অনেক সময় নিলাম আপনার। বাংলা নতুন বছরের শুভেচ্ছা রইল।
জামান

১ মে ২০১৩

জামান,
আপনি আমার বইটি পড়ে যেরকম উদারভাবে প্রশংসা করেছেন, তাতে যেমন আপনার মনের সহজাত কোনো ঔদার্য্যই প্রকাশ পায়, তেমনি এত সুখ্যাতের ওপরে বিচরণ করি তেমন মহত্বও এখনো অর্জন করি নি। তাই অকপটে বলতে হচ্ছে যে আপনার চিঠি পড়ে আমার ভালো লেগেছে। কিন্তু নিছক প্রশংসা বলেই ভালো লেগেছে বললে হয়ত আমার ওপরও একটু অবিচার করা হবে। ভালো লাগার মূল কারণটি হলো যে যে-মনোভাব ও অভিজ্ঞতা-তাড়িত হয়ে আমি বইটি লিখেছিলাম, আপনার বক্তব্যে তার যথার্থ অনুরণন শুনলাম, মনে হলো আপনিও হয়ত একই পথের পথিক। আপনি আমার মনের মতো পাঠক, এইরকম পাঠক পাওয়া সব সময়েই লেখকের জন্য সৌভাগ্য।
মার্কসবাদীরা গাল দেয় নানান কারণে, মূলত বোধহয় এই কারণে যে, সবই ক্যাপিটালিজম-এর দোষ বলিনি।
বাংলাদেশ কেমন শাহবাগের গল্প থেকে সোহেল রানার (রানা প্লাজা) গল্পে এসে পড়ল! আমাদের দেশগুলিতে এই রকমই হতে থাকে। গরীব মানুষের জীবনের দাম এত কম আর দেশগুলো এত corrupt যে এই জিনিস আবার হবে। দুঃখ হয়, কিন্তু "বিদেশী নাগরিক" বলে (ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রেও) কিছু বলার হক পাই না।
ভালো থাকবেন,
দীপেশ দা

~ www.amarboi.com ~

১১ অক্টোবর ২০১৩

দীপেশদা,
আপনারা কয়জন বাঙ্গালী তরুণ মিলে নিজেদের প্রানের উচ্ছলতায় যে তত্ত্ব পৃথিবীর সামনে হাজির করেছেন তা তো দুনিয়ার চিন্তার মানচিত্রটাই বদলে দিয়েছে। বাঙ্গালী হিসেবে মনে মনে নিজেকেও এই গর্বের সুদুর অংশীদার মনে হয়।
কথা সত্য পৃথিবীটা এমন এক পাকচক্রে পড়েছে যে ক্ষেপে ওঠা ছাড়া আর উপায় থাকে না।
ভালো থাকবেন।
জামান

১৩ অক্টোবর ২০১৩

জামান,
সাবল্টার্ন তত্ত্ব ইতিহাসের জগতে একটা হৈ চৈ ফেলেছিলো, সন্দেহ নেই। সেই সুবাদে অনেক প্রশংসা ও নিন্দা দুই কপালে জুটেছিলো। আপনি প্রশংসকদের মধ্যে, সেটা স্বভাবতই আমার ভালো লাগে। কিন্তু সব মিলিয়ে আমরা একটা নতুন ও বড় পৃথিবীতে এসে পড়েছিলাম—আমাদের মনের পরিধি বেড়েছিলো। সেটাই এর একটা ভালোর দিক। ইতিহাসে তর্ক-বিতর্ক তো চলবেই।
আপনাকে আগাম বিজয়ার ও ঈদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
ভালো থাকবেন।
দীপেশদা

১৬ অক্টোবর ২০১৩

দীপেশদা,
বিজয়া আর ঈদের শুভেচ্ছা আপনাকেও। ঢাকার রাজপথে এখন হাজার হাজার গরু ছুটে যাচ্ছে মওলানার হাতের ছুড়ির দিকে, ফুটপাত রক্তাক্ত হবে এরপর, তারপর শহরের বাতাস জুড়ে থাকবে ভুনা মাংসের ঘ্রান, নিউক্যাসেলের হিম হাওয়ায় অবশ্য কোরবানীর এইসব অনুষঙ্গ উধাও। দেশে থাকতে কোরবানী উৎসব নিয়ে তো বিশেষ আগ্রহ ছিলো না, নিউক্যাসলে বসে অবশ্য ঐ এটমোস্ফিয়ার মিস করছি। পোষ্টকলোনিয়াল বিয়িং এর এইসব কন্ট্রাডিকশনের কথা অবশ্য আপনার লেখাতেও আছে। প্রভিন্সিয়ালাইজিং ইউরোপ বইটার ভাবনা ব্যক্তিগতভাবে আমার চিন্তার অনেক জট খুলতে সাহায্য করে। পশ্চিম আমাদের জ্ঞান সরবরাহ করবে আর আমরা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে বসে তা শিখবো, এই তো ছিলো বহুকালের চর্চা। এর ভেতর একটা ইনবিল্ড হীনমন্যতা আছে। কিন্তু আমার কাছাকাছি একটা শহরের অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে আপনারা

~ www.amarboi.com ~

সেই জ্ঞানকাণ্ডে একটা নাড়া দিয়েছেন দেখে আমার ভেতরের সেই আবছা অপমানিত ইগোটা একটু তৃপ্ত হয়। আপনারা ইতিহাসের ক্ষেত্রে কাজ করেছেন কিন্তু সেই সূত্রে রাজনীতি, দর্শন এমনকি পুরো মানব অস্তিত্বের একেবারে গোড়ার কিছু প্রশ্নে গিয়ে তা আঘাত করে বলে আমার মনে হয়। ইউরোপীয় রেশনালিটির ধারণাকে আপনি যেভাবে চ্যালেঞ্জ করেন, আমি নেহাত জ্ঞানতাত্ত্বিক জায়গা থেকে না, একেবারে ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতার জায়গা থেকেও তা খুব বৈধ চ্যালেঞ্জ বলে মনে করি। এটা ঠিক যে, আপনার যুক্তিপরম্পরা ধরে এগিয়ে গেলে খানিকটা অনিশ্চিত চত্বরে গিয়ে পৌছাতে হয়। এই ভাবনা প্রক্রিয়ার আউটকাম একটু আনসারটেইন। আমার ধারণা মার্ক্সিস্টদের বোধহয় এখানেই আপত্তি। মার্ক্সবাদ চর্চার যে রূপের সাথে আমরা পরিচিত তাতে এমবিগুইটিকে জায়গা দেবার সুযোগ নাই। কিন্তু ইতিহাসের এমন একটা ক্রান্তিতে আমরা এসে পৌছেছি যখন সবকিছু নিয়ে নিংড়ে ভাববার সময় এসেছে বলে মনে হয়। তাতে কিছুটা সময় যদি একটা এমবিগুয়াস চরাচরে থাকতে হয় তাহলেও বোধহয় তা ভালো। যিযেক বোধহয় এই ব্যাপারটাকেই একটু আইরোনিকালি বলেছেন 'ডোন্ট এক্ট। থিংক'। অবশ্য যিযেক পুঁজিবাদকেই সব নষ্টের গোড়া বলেন, আপনার লেখা সম্পর্কে তার কি মতো আমি জানি না। আমি নেহাত একজন অর্বাচিন পাঠক হিসেবে আপনার লেখা পড়তে গিয়ে চিন্তার একটা নতুন দিগন্তে গিয়ে পৌঁছাই। কতটা বুঝি জানি না, কিন্তু আমার মতো একটা পাঠ আমি নিই সেখান থেকে। বিশেষ করে বাংলাদেশের যে জনপদে বেড়ে উঠেছি, সেখানকার গনতন্ত্রের মরীচিকা, বাঙ্গালী মুসলমান প্রশ্নে নানা অনিশ্চয়তা ইত্যাদির জট ছাড়াবার একটা সুত্র যেন পাই। আমার কাজের ক্ষেত্র সাহিত্য, চিকিৎসা, নৃবিজ্ঞান কিন্তু এসব প্রশ্ন এড়িয়ে কোন কাজই তো আজকাল করা সম্ভব না। দুর্ভাগ্য, বাংলাদেশে এই চিন্তার সুত্র ধরে জ্ঞানকাণ্ডে কাজ নাই বললেই চলে। যাহোক, সুযোগ পেয়ে অনেক কথা বলে বসলাম। আপনার সাথে যোগাযোগ থাকবে আশা করি।

ভালো থাকবেন।

জামান

২০ অক্টোবর ২০১৩

জামান,

আপনি আমাদের লাইনের মানুষ না-হয়েও যত সহজে আসল কথাগুলি বুঝেছেন, তত সহজে অনেক সমাজবিজ্ঞানী বোঝেননি বা এখনো বোঝেন না! মাঝে মাঝে ভাবি, খুব তর্ক করি, কিন্তু বয়স হয়েছে, এখন আর তর্কের তাৎক্ষণিক উত্তেজনায় সময় নষ্ট করতে ইচ্ছা করে না। একটা মুশকিল কী, আজকাল উপমহাদেশের পড়াশুনায় এমন অনেক মানুষ এসেছেন যাঁদের জন্ম উপমহাদেশে হলেও তাঁরা আজন্ম ইংরিজি বলে ও মনে মনে পাশ্চাত্যের হয়ে বড় হয়েছেন। আমাদের মতো

~ www.amarboi.com ~

দ্বিভাষী বা ত্রিভাষী হবার অভিজ্ঞতা তাঁদের নেই—কথাটা আক্ষরিক ও রূপকার্থে, দুভাবেই বললাম। ফলে এঁদের আমাদের মতো কোনো পিছুটানও নেই। এনারা সকলের মঙ্গল চান, কিন্তু সেই "সকলের" কোনো নির্দিষ্ট চেহারা থাকে না। আপনি যখন দেশের কথা ভাবেন, রানা প্লাজার ঘটনায় ব্যথিত হন, তখন যে মানুষগুলির কথা ভাবেন, তাঁদের চেহারা, ভাষা, কল্পনা আপনিও কল্পনা করতে পারেন। ফলে একটা অন্য ইতিহাস, অন্য অতীত, ফলে সম্ভাব্য অন্য ভবিষ্যতও আপনার চোখে লেগে থাকে। এই অন্য-বোধ না-থাকলে সাবল্টার্ন স্টাডিজের অন্তস্থ কথা পুরোটা ধরা যায় না। তখন এই সব খামাখা-মার্কসবাদ-এর তক্কাতক্কি হয়।

আমাদের বাঙালি হিসেবে বাঙলার হিন্দু-মুসলমানের ইতিহাস নিয়ে অনেক কাজ করার আছে। দুই পক্ষেই ভয়ানক বিষ জমেছে অনেক দশক ধরে।

আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানবেন,

দীপেশদা

২২ অক্টোবর ২০১৩

দীপেশদা,

ধন্যবাদ আপনাকে। সাবঅলটার্ন ভাবনার অলিগলির খোঁজ সব নিতে পারিনি কিন্তু প্রধান সড়কটা খানিকটা চিনবার চেষ্টা করছি। আপনি যখন বলছেন মূল ভাবনাটা ভুল বুঝিনি তখন তা নিশ্চয়ই একটা বড় কমপ্লিমেন্ট। 'পিছুটান' কথাটা খুব মোক্ষম বলেছেন। পৃথিবীর নানা দেশে ঘুরেছি কিন্তু সকলের জন্য নয়, ঐ নির্দিষ্ট একটা জনপদের জন্য পিছুটান আমাকে বারবার নিয়ে গেছে ঐ অন্য অতীত, অন্য ভবিষ্যত খোঁজার তাড়নায়। আপনার লেখায় আমি অন্য ভবিষ্যত ভাবনার যে স্পষ্ট চাবিটা পেয়েছি সেটার সঙ্গে আমার আগে পরিচয় ছিলো না। ঐ চাবি দিয়ে এখন আমি অনেক তালাই খুলতে পারছি।

ধর্মীয় পরিচয় ব্যাপারটাকে পরিচয়ের প্রধান শর্ত করবার দিন ভেবেছিলাম আমরা পার করে এসেছি। কিন্তু বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ের ঘটনাবলী আমাদের আবার নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে সাম্প্রদায়িক ভাবনা ব্যাপারটা কতটা ভেতরে ঢুকে আছে। এবছর ঢাকার শাহবাগ আন্দোলন বাংলাদেশের রাজনীতির জন্য নানাভাবে খুব তাৎপর্যপুর্ন। আমি ঢাকার এক দৈনিকে নিয়মিত কলাম লিখি, তাতে শাহবাগ নিয়ে বেশ লিখেছি। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে চোরাস্রোতের মতো সাম্প্রদায়িক এবং অসাম্প্রদায়িক দুটি ধারা পুষ্টি পেয়ে আসছে, শাহবাগ দেশের এই বিভাজনকে স্পষ্ট করেছে। অনেকগুলো বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশ্নও সামনে এনে দিয়েছে। বাঙ্গালী মুসলমানের অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে বুঝে উঠবার চেষ্টা খুব বেশী বোধহয় হয়নি। যাহোক, কখনো আপনার সময় হলে শাহবাগ নিয়ে আমার টুকরো ভাবনার কলামগুলো শেয়ার করবো।

~ www.amarboi.com ~

এমনিতে অন্য একটা জিজ্ঞাসা ছিলো আপনার কাছে। আপনি ফলো করেছেন কিনা জানি না। বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে নানা ঝক্কি চলছে। একজন অপরাধী মওলানা সাঈদী বাংলাদেশে গ্রামগঞ্জে রীতিমত তারকা পর্যায়ের ওয়াজির, কোরানের তফসীর-কারক। তার ফাঁসির আদেশ হলে বাংলাদেশে কিছু কিছু গ্রামে গুজব ছড়ায় যে চাঁদে সাঈদীর মুখ দেখা গেছে। মাঝরাতে গ্রামের হাজার হাজার মানুষ বেরিয়ে আসে চাঁদে সাঈদীকে দেখতে। একে কেন্দ্র করে পরে বহুরকম তুলকালাম কাণ্ড হয়। যাহোক, এমনিতে ব্যাপারটাকে সমাজতাত্ত্বিকভাবে বুঝতে ছোট পাঠচক্রে কিছু তরুণ তর্ক তুলেছিলো চাঁদে সাঈদীর মুখ দেখাটাকে সাবঅলটার্ন রেজিষ্ট্যান্স হিসেবে দেখা যায় কিনা। খোঁজ যা পাওয়া গেছে তাতে দেখা গেছে এধরনের গুজব তৈরির পেছনে একটা স্বার্থান্বেষী মহলের ব্যাপক ম্যানুপুলেশন ছিলো। সেক্ষেত্রে এধরনের ঘটনাকে সাবঅলটার্ন বয়ান থেকে পাঠ করার সুযোগ কতটুকু? আপনারা যে কৃষক চৈতন্য নিয়ে কাজ করেছেন আজকের কৃষকের চৈতন্য তা থেকে তো যোজন দূরেরই হওয়ার কথা। ঐ নতুন কৃষকচেতন্যকে বুঝবার চেষ্টা কতটুকু হয়েছে?

তবে দীপেশদা, আপনার দরকারী সময় ব্যয় করে আমার এসব আনাড়ী প্রশ্নের উত্তর দেয়ার কোন প্রয়োজন নাই। কখনো অবসর হলে দু'চার লাইন লিখবেন। আপনি যে মাঝে-মাধ্যে আমার মেইলের উত্তর দিচ্ছেন এতেই আমি খুব আনন্দিত।

ভালো থাকবেন।

জামান

২৩ অক্টোবর ২০১৩

জামান,

এ কথা ঠিক যে সব গুজবকেই নিম্নবর্গের প্রতিরোধ ভাবা ভুল হবে। স্টক মার্কেট তো চলেই খানিকটা গুজবের ভিত্তিতে। গুজবে যেমন মানসিকতার প্রশ্ন ওঠে তেমনি গুজব স্বেচ্ছা-প্রণোদিতভাবে ছড়ানোর প্রশ্নটা থেকে যায়। আমাদের দেশে দাঙ্গা বাঁধাতে অনেক সময়েই ইচ্ছে করে গুজব ছড়ানো হয়, সন্দেহ নেই। আর আপনার সঙ্গে আমি একমত যে, বাঙালি মুসলমানের অভিজ্ঞতাকে শুধু তাত্ত্বিক কেন, ঐতিহাসিকভাবেও পুরোটা বোঝা হয়নি। আজকের কৃষক চৈতন্য ও ঔপনিবেশিক সময়ের কৃষক চৈতন্য এক করে দেখলে ভুল হবে, আবার হয়ত কোনো সম্পর্ক নেই ভাবলেও ভুল হবে।

আপনি কখনো সুবিধেমতো আপনার লেখাগুলো পাঠাবেন। আমিও সুবিধেমতো পড়ে নেব। ভালো থাকবেন,

দীপেশদা

~ www.amarboi.com ~

১ নভেম্বর ২০১৩

দীপেশদা,

ওয়েবে আপনার যে বক্তৃতাগুলো পাওয়া যায় সেগুলো সব শুনবার চেষ্টা করছি। আপনার ভাবনার ধারাটি এবং তার প্রকাশের সারল্য আমাকে আকৃষ্ট করে। আপনি পোষ্ট-কলোনিয়াল এবং সাবঅলটার্ন ভাবনাকে একটা নতুন এবং ভিন্ন পর্দায় নিয়ে গেছেন বলে আমার মনে হয়। পাশ্চাত্যের সমালোচনা তো নানাভাবে হয়েছে, কিন্তু আপনি পাশ্চাত্যের আধুনিকতার ধারণাটাকে যেভাবে একেবারে গোড়ায় গিয়ে টুটি চেপে ধরেছেন তা দারুনভাবে নাড়া দেয়। কথিত লিবারালিজম অথবা সোসিয়ালিজমের বাইরে আমাদের মতো দেশগুলোর জন্য একটা নতুন ইতিহাস খোঁজার আপনার এই যে দাবী, এক্ষেত্রে আর কাকে আপনি আপনার সহচিন্তক মনে করেন?

শুভেচ্ছা

জামান

১ লা নভেম্বর ২০১৩

জামান,

আপনার উদারমনা ও উৎসাহব্যঞ্জক কথাগুলিতে উৎসাহ পাই, কোনো সন্দেহ নেই, সে কারণে ধন্যবাদ জানবেন। আপনি যে ইন্টারনেটে আমার বক্তৃতা সব দেখেছেন, সেটা জেনেও ভালো লাগলো।

সহচিন্তক তো অনেকেই: আশিসদা (নন্দী), পার্থ চট্টোপাধ্যায়, গৌতম ভদ্র, রণজিৎদা (গুহ), আপনি, আহমেদ কামাল, আরও অনেকেই এ-কথা অন্তর দিয়ে বোধ করেন যে, পশ্চিমী লিবারালিজ্‌ম বা সমাজতন্ত্র, এ-গুলি আমাদের দেশে যদি কল্যাণমূলক করতে হয়, তাহলে কোথাও একটা আমাদের রীতি-নীতি, অতীত ইত্যাদির সঙ্গে সাযুজ্য না-তৈরি করতে পারলে উপায় নাই। এখানে যাবার পথ কেউই সঠিক জানি না, ও তা নিয়ে তর্ক হওয়া স্বাভাবিক।

তার ওপরে এটাও মানতে হবে যে, আমাদের মতো মানুষ সংখ্যায় কম ও পৃথিবীর গতি এক বল্গাবিহীন ভোগবাদের দিকে, যদিও তা কদ্দিন চলবে জানি না। এই অবস্থায় নিজেদের মতো চিন্তাভাবনা ও কাজকর্ম করা ছাড়া উপায় কি? যা যৌক্তিক মনে হয়, তা বলতেই হবে। এর মধ্যে এই যে আপনার মতো মানুষের সঙ্গে একটা সহমর্মিতা পাওয়া যায়, এটাই পাথেয়।

ভালো থাকবেন,

দীপেশদা

~ www.amarboi.com ~

৩ রা নভেম্বর ২০১৩

দীপেশ দা,
যদুনাথ সরকারের বইটার ব্যাপারে কৌতুহলী হয়ে রইলাম। আর্কাইভে তার চিঠির মুখোমুখি হওয়ার প্রেক্ষিতে আপনি আপনার আবেগগত যে বর্ণনা দিয়েছেন ইতিহাসের জনজীবন বইটাতে তা কেবল একজন ঐতিহাসিকের না, একজন কবিরও। আমার অনেক ক্ষেত্রেই মনে হয়েছে একজন কবির মন নিয়ে আপনি ইতিহাসের দিকে তাকান। সেটা একটা বড় শক্তি বলেই মনে হয়। জ্ঞানকাণ্ডের, রসকাণ্ডের এই দেয়ালগুলো ভেঙ্গে গেলে মন্দ কি?
আমাদের রীতিনীতি অতীত বিবেচনায় রেখে আমাদের ভবিষ্যত রচনা যে কতটা জরুরী তা টের পাই অহর্নিশ, কিন্তু সে পথ এখনও কুয়াশায় ঢাকা। আপনার এবং আপনার সহচিন্তকদের লেখাপত্রে সে কুয়াশা কিছুটা কাটে। কিন্তু এ-ও বুঝি বহু প্রশ্নই অমীমাংসিত রয়ে গেছে। হাঁটতে হবে বহুদুর। চারিদিকে ভোগের মহোৎসব দেখে বিমূঢ় হয়ে যাই। অথচ পৃথিবীজুড়ে জীবনের কি ল্যাজেগোবরে অবস্থা। এতটা নাগরদোলার বাস্তবতা নিয়ে একটা গ্রহ এতদুর চলতে পারে? অক্সফোর্ডে এলে দেখা হলে ভালো লাগবে। জানাবেন।
শুভেচ্ছা,
জামান

৪ নভেম্বর ২০১৩

জামান,
আপনার মতো পাঠক পাওয়া আমার সৌভাগ্য। সবাই এত মনের মিল নিয়ে পড়ে না। যদুনাথ সম্পর্কিত বইটি প্রকাশিত হলে আপনাকে এক কপি দেব. আশা করি আপনার ভালো লাগবে। কিন্তু সেও বেরুতে বেরুতে ২০১৫ হয়ে যাবে মনে হয়। আগামী বছরে আমার ওই ক্লাইমেট চেঞ্জ বিষয়ের বইটি ধরব, সে তো এই গ্রহটার দুর্গ্রহ নিয়েই। মানুষের বুদ্ধি অনেক, কিন্তু সামুহিকভাবে দূরদৃষ্টির অভাব। ফলে মনে হয়, বুদ্ধি আছে, কিন্তু শুভবুদ্ধি নেই। কিন্তু মানুষ যা, তাই থাকবে, তাই নিয়েই তো চলা।
আর্বানা এসেছি বক্তৃতা করতে। ভাবতে অবাক লাগে এখানে রবীন্দ্রনাথ এসে ১৯১৩ সালে কয়েক মাস ছিলেন।
ভালো থাকবেন,
দীপেশদা

১০ নভেম্বর ২০১৩

দীপেশ দা,
যদুনাথ নিয়ে বইটার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে রইলাম। সেই সুত্রে কাকে বলে ইতিহাস, কাকে বলে গবেষণা ইত্যাদি নিয়ে আমাদের অঞ্চলের ভাবনার যে ইতিবৃত্ত তারও এটা

~ www.amarboi.com ~

নমুনা পাওয়া যাবে আশা করছি। আপনি ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়েও যে বই লিখছেন সেটা জেনে খুবই খুশী হলাম। এ নিয়ে তো এখন বিস্তর হৈ চৈ কিন্তু একজন ইতিহাসবিদ হিসেবে আপনি যেভাবে ব্যাপারটা এপ্রোচ করছেন সেটাও খুব জরুরী। এ নিয়েও আপনার লেকচারটা শুনেছি। ইতিহাসবিদ হিসেবে এক স্তরে আপনি মানুষের ইতিহাসের ভিন্নতার দিকে চোখ রাখছেন কিন্তু অন্যস্তরে জলবায়ুর প্রশ্নে আপনি মানব অভিজ্ঞতার ঐক্যের দিকে নির্দেশ করছেন এটা খুব অনুপ্রেরণাদায়ী। জীবনানন্দ একটা কবিতায় মানুষকে 'পৃথিবী গ্রহবাসী' বলে সম্বোধন করেছিলেন। একাধারে নির্দিষ্ট আবার সার্বজনীন এই মানব অভিজ্ঞতাকে ধারণ করা বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জ নিশ্চয়ই। আমি এব্যাপারে খুবই একমত যে শেষ বিচারে জলবায়ু একটা 'নৈতিক' প্রশ্নে পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু এই বোধ সর্বসাধারণের কাছে কি করে পৌছানো যাবে সেটাই এক বড় প্রশ্ন বোধ হয়। বাজারের নীতি বোধহয় এখানে কাজ দেবে না। বাজারের বার্তা তো ব্যক্তিঅভিমুখীন, পণ্যের আবেদন তো ব্যাক্তির কাছে। জলবায়ু পরিবর্তন হলে ব্যাক্তি হিসেবে একজনের কি লাভ তার হিসেব কষা তো মুশকিল। সে হিসাব মিলতে পারে কেবল দুরদৃষ্টির প্রেক্ষিতে প্রশ্নটা বিচার করলে কিন্তু সে দূরদৃষ্টির তো আকাল, যেমনটা আপনি বললেন। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে লাইফষ্টাইল পরিবর্তনের প্রশ্নটা তো জড়িয়ে গেছে অঙ্গাঙ্গীভাবে। কিন্তু ব্যক্তি কেন তার লাইফষ্টাইল পরিবর্তন করবে যদি না ব্যাষ্টি তার মাথায় থাকে। তার নমুনা তো দেখি না। পশ্চিমে দেখছি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চর্চা একেবারে ব্যক্তি সর্বস্বতার চর্চায় পরিগণিত হয়েছে।

ভালো থাকবেন।

জামান

১০ নভেম্বর ২০১৩

জামান,

বসে বসে একটা বেশ খারাপ পি.এইচ.ডি থিসিস পড়ছি, পাকিস্তানে কমুনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস, আমারি ছাত্রীর লেখা কিন্তু বেশ খারাপ, এত কট্টর ট্রটস্কিপন্থী যে দেশীয় ও স্পেসিফিক ইতিহাসের কোনো বোধ নাই, এমন সময় আপনার চিঠি এলো। চিঠিটা পড়ে আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, দ্যাখো, এই জামানের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় নাই, তবু মনে হয়, এই মানুষটার সঙ্গে আমার কত মনের মিল, ইনি যখন আমার লেখা নিয়ে মন্তব্য করেন, তখন শুধু যে আমি আমার কথার প্রকৃত অনুরণন শুনতে পাই তা-ই নয়, এঁর আত্মপ্রকাশের ভাষা থেকে আমিও শিখি, এঁর ভাষার সংস্পর্শে এসে যেন আমার ভাষাও একটা পূর্ণতা খুঁজে পায়। এই যে আপনি জীবনানন্দের কথা তুললেন, তাতে যেন আমি নিজের কথাই আরো পরিষ্কারভাবে শুনতে পেলাম। তিনিও তো গভীরভাবে বাংলার মানুষ হয়েও এই শুভবুদ্ধি কোনদিন হারাননি যে, তিনি "পৃথিবী গ্রহবাসী"

~ www.amarboi.com ~

মানুষ প্রজাতিরও সভ্য। আপনি অনেক যথার্থ কথা বলেছেন—জলবায়ুর ইতিহাসে কোথাও যদি আমরা এ কথা মাথার মধ্যে না-রাখতে পারি যে, আমাদের সমস্ত পার্থক্য ও দ্বন্দ্বের সত্যতা সত্তেও এটাও সত্য যে, আমরা একই প্রজাতি, তা আমাদের ধর্ম, ভাষা, গায়ের রং, জাত, ইত্যাদি যতই আলাদা হোক না কেন, আমরা পৃথিবীর জল-বায়ুর সমস্যার মোকাবিলা করতে পারবো না। কারণ, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে হলেও সত্যি, এটা সকলের সমস্যা। কিন্তু এই "সকলের" তো কোনো রাজনীতি বা প্রকাশ নেই। পরন্তু, বর্তমান ধনতন্ত্র মানুষের মধ্যে সুবিধাভোগী শ্রেণীদের একটা ভয়াবহ ভোগবাদের আবর্তে নিয়ে ফেলছে। এর মধ্যে আমার মতো ক্ষুদ্রজন নিজের চিন্তাটাকেই প্রকাশ করতে পারে, তার বেশি তো হাতে নেই। অন্তত আমার হাতে নেই।

যাই হোক, আপনার চিঠি পেয়ে ভালো লাগায় এই সব লিখলাম। আশা করি, অর্থহীন শোনাবে না কথাগুলো।

ভালো থাকবেন,

দীপেশদা

১১ নভেম্বর ২০১৩

দীপেশ দা,

আপনি বড় মনের মানুষ বলে আমার মতো এমন অর্বাচিনকে নিয়ে এতসব সদয় কথা-বার্তা বলেছেন। আপনি আপনার চিন্তা প্রকাশ করে অনেক মানুষের চিন্তার জট খুলে দিয়েছেন এই তো এক বিরাট কাণ্ড। সত্যি বলতে আপনার প্রভিন্সিয়ালাজিং ইউরোপ পড়তে পড়তে আমার মনে হচ্ছিলো—আমার অনেকদিনের ভাবনার জমাট-বাঁধা বরফের উপর যেন হঠাৎ সুর্যালোক পড়ে তা ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছে। খুব ভারমুক্ত বোধ করেছিলাম।

এই যে বিশ্বমানের একজন ভাবুকের সঙ্গে আমার এক প্রিয় কবিকে নিয়ে কথা বলতে পারছি সেটাও তো একটা দুর্লভ পাওয়া। বাঙ্গালী বলেই না সেটা সম্ভব হলো। আমি গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি লিখবার চেষ্টা করি, আগেই জানিয়েছিলাম। সম্প্রতি জীবনান্দকে নিয়ে একটা ডকুফিকশন ধরনের কাজ করছি। ফলে তাকে নিয়ে বেশ বুঁদ হয়ে আছি। তার অন্যান্য যাবতীয় লেখা তো পড়া ছিলোই, সবে তার সব-ক'টা গল্প আর উপন্যাস পড়ে উঠলাম। অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। তার ফেলে যাওয়া ট্রাঙ্কের গহ্বর থেকে এই যে সব পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা যেন তুতেনখামেনের গোপন মনিমাণিক্যের মতো।

পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট আন্দোলন নিয়ে যে থিসিসটার কথা বলেছেন তাতে কি সে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিষ্টদের কথাও তুলেছে?

ভালো থাকবেন।

জামান

~ www.amarboi.com ~

১৪ নভেম্বর ২০১৩

জামান,

আপনি জীবনানন্দকে নিয়ে ডকুফিক্‌শন করছেন শুনে খুব খুশি হলাম। এ মানুষটিকে নিয়ে আরো অনেক কাজ হওয়া উচিত। আপনি সংবেদনশীল মন নিয়ে যা করবেন, তা ভালো হবে। কী করেন, জানতে আগ্রহী রইলাম। এই বুঁদ হয়ে থাকার অবস্থাটা বড় আনন্দের, তাই না? খানিকটা সুফিদের "ফানা"র মতো! এক সময় আমার হাইডেগার নিয়ে এই রকম হয়েছিলো। গত গরমে যদুনাথ নিয়েও হয়েছিলো। তবে নানান কারণে এখন বড় সময়ের অভাব বোধ করি।

আমার পাকিস্তানি ছাত্রীর থিসিসে পূর্ব পাকিস্তানের কমুনিস্টদের কথাও ছিলো, কিন্তু বেশির ভাগটাই ছিলো পাঞ্জাব নিয়ে। অনেকখানি কাহিনীই সাজ্জাদ জাহিরের।

আপনি ভালো থাকবেন ও আমার অনেক শুভেচ্ছা জানবেন।

দীপেশদা

২৬ নভেম্বর ২০১৩

(প্রবাস জীবন নিয়ে আমার একটি লেখা দীপেশ দাকে পাঠিয়েছিলাম। সেটি পড়ে প্রতিক্রিয়া জানান তিনি)

জামান,

আপনার লেখাটি পড়ে বেশ লাগলো। সব দৃশ্যটাই আমার খুব পরিচিত। জানেন, দেশ ভাঙ্গার পর আমার মা-বাবা-র মনেও পূর্ববঙ্গের জন্য এইরকম একটা মোমবাতি জ্বলতো। আমার তো ঢাকার সঙ্গে পরিচয় সেই ছোট্টবেলা থেকে, মায়ের এলবাম দেখে। সেই মোমের আলো কখন নিজের মধ্যেও জ্বলেছিলো জানি না, কিন্তু এখনো জ্বলে। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে নিজের পরিচিত কলকাতার জন্য যে মোমবাতি—তাকে হয়ত ভুল করে মনবাতিও লেখা যায়—সেটি। আর ওই নিজের সন্তানের মধ্যে নিজের শৈশব ফিরে না-পাবার যে দুঃখ, তাকে আমি অন্ত রঙ্গভাবে চিনি।

কাল আনন্দবাজারে একটা মজার কথা পড়লাম, জানেন—কলকাতায় এখন "বেবাক" বলতে অনেকে "নির্বাক" বোঝেন, আমরা বাঙাল বলে ফার্সি "বেবাক" বা বাঙালের "ব্যাবাক"-এর সঙ্গে বেবাক পরিচিত ছিলাম। পড়ে মনে হলো, কী জানি, হয়ত বাঙালের সংখ্যাও কমছে কলকাতায়।

নানান বিভেদের লড়াই এড়িয়ে সর্বমানবিকতার সাধনা হয়ত হয় না, কিন্তু হয় যে না, এটা রবীন্দ্রনাথকে ব্যথিত করতো। হয়ত একটা ইউটোপিয়ার জন্যই কষ্ট হত ওঁর। আবার এটাও ঠিক যে এই সব ন্যায্য ও অন্যান্য বিভেদের লড়াই লড়তে

~ www.amarboi.com ~

গিয়ে আমরা সর্বমানবিকতার পথ থেকে প্রায়শই সরে যাই। এখানে সঠিক পন্থা যে কি হবে, আমি সত্যিই জানি না। কিন্তু ভাবনাটার প্রয়োজন মনে হয়।
ভালো থাকবেন। প্রীত্যন্তে,
দীপেশদা

৩ জানুয়ারি ২০১৪

জামান, ইংরিজি নতুন বছরের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানবেন।
আমি যদুনাথ-সম্পর্কিত বইটি শেষ করে ও আজ প্রেসে দিয়ে কিছুটা অ-নাথ বোধ করছি।
আপনার সর্বৈব মঙ্গল আশা করি।
দীপেশদা

৩ জানুয়ারি ২০১৪

দীপেশদা,
আপনাকেও শুভেচ্ছা নতুন বছরের।
যদুনাথ শেষ করেছেন, সেটা তো বিরাট ব্যাপার। খানিকটা অ নাথ লাগবারই কথা!
আমি আছি মোটামুটি। বাংলাদেশ এক জটিল অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সেসব নিয়ে ভাবনাচিন্তার মধ্যে আছি। আপনার ইংল্যান্ড আসার দিন কি ঠিক হলো?
ভালো থাকবেন।
জামান

৫ জানুয়ারি ২০১৪

দীপেশদা,
বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা নিয়ে ছোটখাটো একটা বই-ই প্রকাশ করে ফেলেছি। গতবছর বাংলাদেশের শাহবাগ আন্দোলন দেশের জন্য একটা মোড় ফেরানো ঘটনা বলে আমি মনে করি। আপনি সেই আন্দোলনের খোঁজ পেয়েছেন আশা করি। দেশের এই মুহূর্তের জটিলতা বুঝতে শাহবাগ আমাকে সাহায্য করে। গত বছর-কাল জুড়ে আমি পত্রিকায় এই শাহবাগকে কেন্দ্র করে বেশকিছু কলাম লিখেছিলাম; সেগুলো সংকলন করেছি এই বইয়ে। সেই সঙ্গে এক তরুণ লেখকের সঙ্গে এনিয়ে এবং বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট আরো নানা প্রসঙ্গে ই-মেইল চালাচালি হয়েছে। সেই ই-মেইলগুলোও বইটাতে যুক্ত করছি। সাম্প্রতিক বাংলাদেশ নিয়ে আমার একটা সংক্ষিপ্ত, সাধারণ পাঠ আছে বইটাতে। বইটা প্রকাশিত হবে এ মাসেই। আপনাকে বইটার একটা প্রুফ কপি পাঠালাম।

~ www.amarboi.com ~

পুরোপুরি প্রুফরিডিং হয়নি। সঙ্গে বইটার প্রচ্ছদও পাঠালাম। কখনো যদি পড়বার সময় করে উঠতে পারেন এবং কোনো মন্তব্য থাকে তাহলে জানতে খুব আগ্রহী হবো। আপনার মন্তব্য পেলে আমার ভাবনার ফাঁক ফোঁকড়গুলোও বুঝতে পারবো নিশ্চয়ই।
ভালো থাকবেন।
জামান

৮ জানুয়ারি ২০১৪

জামান,
অবশ্য পড়বো। শেখার জন্যই পড়বো। মতামতও জানাবো নিশ্চয়ই। কিন্তু মূল কাজ, শেখা। কারণ, যে প্রাত্যহিককে জেনে আপনারা লেখেন, তার সঙ্গে তো আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কোনো যোগাযোগ নেই। অথচ বাঙালির ইতিহাসেরই একটি সাম্প্রতিক ও মৌলিক ধারা আপনাদের জীবনের মধ্যে দিয়ে বইছে। সে সম্বন্ধে না-শিখলে চলবে কী করে? বাঙালি হিসেবে নিজেকে খুব অসম্পূর্ণ লাগে বাংলাদেশের ইতিহাস না-জানলে।
শুভেচ্ছা,
দীপেশদা

২৯ জানুয়ারি ২০১৪

জামান,
এর মধ্যে আপনার বইটি পড়ে ফেলেছি। ভালো লাগলো, তা ছাড়া আপনার সঙ্গে তৈমুর রেজার আলোচনাটি খুবই উপভোগ্য। শুধু উপভোগ্য বললে ভুল হয়, আপনাদের আলোচনা থেকে অনেক-কিছু শিখলাম, আবার অনেক পরিচিত প্রশ্নও বাংলাদেশের পরিপেক্ষিতে নতুন করে তোলা হলো, ও সেই-সঙ্গে নতুন কিছু প্রশ্নও এলো। আমার অনেক সময়েই মনে হয়—বাঙালির ইতিহাসে তিনটে ভাগ আছে :
(১) ১৯৪৭-পূর্ব ইতিহাস, (২) পশ্চিমবঙ্গের ও পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাস, ও (৩) বাংলাদেশের ও পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস। এরই মধ্যে অনেক কিছু দুই ধারার মধ্যে সাঁকোর মতো কাজ করে, সেখানে যেমন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, লালন, জসীম উদ্‌দীনরা আছেন, আবার নানান সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত ও সামাজিক প্রথাগত মিলনও আছে। কিন্তু শাহবাগ আন্দোলন থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক নির্বাচন পর্যন্ত ঘটনায় এমন অনেক ইতিহাস প্রকাশ পায় যাকে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতেই বুঝতে হবে। সেই কারণেই আমার মতো মানুষের আপনাদের ছাত্র হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং আপনাকে আবার ধন্যবাদ জানাই আমাকে বইটি পড়তে

~ www.amarboi.com ~

দেবার জন্য। সাবল্টার্ন ঐতিহাসিকদের আলোচনা যে আপনাদের প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে, তা দেখে সত্যি ভালো লেগেছে।

বইটি পড়ে একটা প্রশ্ন আমার মনে থেকেই গেছে, সেটা হলো এই: আপনি ও তৈমুর দুজনেই জনজীবনে ইসলামের গুরুত্বের কথা স্বীকার করেছেন। এখন, ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে আমার জানতে ইচ্ছে করে, এই যে জামায়েতি ক্রিটিক্যাল মাস বেশকিছু বছর ধরে তৈরি হলো, এটাকে কীভাবে বুঝবো? কেবল সৌদি প্রচার বা পয়সা, কিম্বা বিশেষ রাজনৈতিক পার্টির মদত দিয়ে মানুষের মনের ইতিহাস তো বোঝা যাবে না। এর মধ্যে কি গ্রাম-শহরের ফারাকের সাম্প্রতিক ইতিহাস, শিক্ষায় বৈষম্যের ইতিহাস, রেগুলেশন-হীন অর্থনৈতিক উদারীকরণ ও তৎসংলগ্ন গরীব মানুষের শোষণ (যা থেকে রানা প্লাজা হোলো), সেই সব ইতিহাস ঢুকে বসে আছে? ভারতবর্ষে অনেক সৎচিন্তার মানুষের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সত্যিকারের যোগ নাই (অবশ্যই এর ব্যতিক্রম আছে), আপনাদের দেশেও কি সেইরকম একটা সমস্যা আছে?

আমার প্রশ্ন যা-ই থাক, আমি ছাপার অক্ষরে আপনাদের সাহচর্য পেয়ে খুবই আনন্দিত ও উপকৃত হলাম। আপনাদের আলোচনা চিন্তাসমৃদ্ধ।

দীপেশদা

২৯ জানুয়ারি ২০১৪

দীপেশদা,

সময় করে বইটা যে পড়েছেন এবং মন্তব্য জানালেন সেজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। লেখাগুলো আপনার কাছে কাজের মনে হয়েছে, সেটা আমার জন্য অনেক আনন্দের খবর। এব্যাপারটা খুবই অনুভব করি যে, ভারত এবং পশ্চিমবঙ্গের সাথে একটা ঐতিহাসিক যোগসুত্র থাকলেও বাংলাদেশকে আলাদা করে বোঝা খুব দরকার। এ-নিয়ে কাজকর্ম খুব বেশী নাই। বাংলা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে যে কাজ হয় তা সবসময় আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক থাকে না। বাংলাদেশ একটা ক্রান্তির ভেতর দিয়ে যাচ্ছে যা বুঝতে এখানকার ভেতরের গল্পগুলো জরুরী। ইসলামের ক্রিটিকাল মাস তৈরি হওয়ার সাথে গ্রাম-শহরের ফারাক, শিক্ষার বৈষম্য, মার্কেট ইকোনমি ইত্যাদির সম্পর্ক তো সন্দেহাতীতভাবেই আছে। তার কিছু ইঙ্গিত তৈমুরের সঙ্গে আলাপে আছে। তবে ব্যাপারটাকে আরো খোলাসা করে বোঝা দরকার, যা আপনি বললেন। সাব-অলটার্ন ভাবনা আমাদের কাউকে কাউকে খুবই তাড়িত করছে। ভাবনার অনেক জট খুলতে সাহায্য করেছে। তাত্ত্বিক জায়গাগুলো আরো ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করছি। সেক্ষেত্রে আপনার সঙ্গে এই যে যোগাযোগ তা আমার জন্য একটা বড় প্রাপ্তি। তবে বাংলাদেশেও সাবঅলটার্ন ভাবনার বিরোধীতা আছে আবার অপপ্রয়োগও আছে। ইসলামী জঙ্গীত্বকে

~ www.amarboi.com ~

সাবঅলটার্ন তত্ব দিয়ে এখানে কেউ কেউ লেজিটেমাইজ করেন। আবার মার্ক্সবাদীদের বিরোধীতা তো আছেই। মার্ক্সবাদীদের বিরোধীতার মূল যে জায়গাটা আমি দেখতে পাই, সেটা হচ্ছে তারা বলেন—সাবঅলটার্ন তাত্বিকরা কালচারাল রিলেটিভিটির কথা বলতে গিয়ে, মানুষের শোষণের অভিজ্ঞতার যে ইউনিভার্সালিটি আছে সেটাকে নাকচ করে, সেই সঙ্গে একথাও তোলা হয় দেখি যে, সাব-অলটার্ন ভাবনার কোন এপ্লাইড ডাইমেনশন নাই। এ-নিয়ে আপনার মতো জানতে পারলে খুশি হতাম।

আপনি ফেব্রুয়ারীতে ইউকে-তে আসবেন লিখেছিলেন। তারিখ কি ঠিক হয়েছে? আপনার সাথে দেখা হবে ভেবেছিলাম, কিন্তু সম্ভাবনা কম দেখছি কারণ, আমি ফেব্রুয়ারি ১০ তারিখ ঢাকা যাচ্ছি, পুরো মাসই থাকবো। যাহোক তারপরও জানিয়েন কবে আসছেন।

ভালো থাকবেন।

জামান

১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

জামান,

আপনার বন্ধুত্ব তো আমারও প্রাপ্তি। বাংলাদেশের একটা স্বতন্ত্র ইতিহাস আছে, তাকে তার নিজের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে বৈ কি। এই কারণেই অনেক শেখার থাকে আমাদের। সাবল্টার্ন চিন্তার বিরোধিতার সঙ্গে তো আমিও পরিচিত। কেবল এইটুকুই বলতে পারি যে ভুল-ভ্রান্তি যাই থাক না কেন, আমাদের প্রচেষ্টায় সততার অভাব ছিলো না। আমরা উপমহাদেশের ইতিহাস মার্কসবাদী বীক্ষা থেকে দেখতে গিয়ে যে সকল চিন্তার ও গবেষণার সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি বলে মনে করেছি, সেই সব সমস্যার সমাধানের সুত্র খুঁজতে গিয়ে এমন অনেক চিন্তাভাবনার জগতে গিয়ে পড়েছি যার সঙ্গে, অন্তত কোনো কোনো ক্ষেত্রে, মার্ক্সবাদের ফারাক ছিলো। সম্প্রতি ডারহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা মারিয়া দিমোভা-কুকসনের কাছে যে সাক্ষাতকার দিয়েছিলাম, বছর দেড়েক আগে সেটি ছাপা হয়েছে। আপনার সময় হলে একবার দেখতে পারেন, আপনার উত্থাপিত কিছু প্রশ্নের আলোচনা করেছি সেখানে। হয়ত গুগল-বুকস করলে পেয়ে যাবেন।

একটা কথা জিজ্ঞাসার ছিলো: "মজলুম" কথাটির মানে কী? আপনারা "মজলুমী" বিশেষণটি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু আমার আরবি-ফার্সি শব্দের বাংলা অভিধানে কথাটা পাইনি।

এ যাত্রা তো দেখা হবে না-ই, মনে হচ্ছে। আমি ইংলন্ডে ১৫ থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত থাকব, কিন্তু আপনি তো তখন দেশে। যা হোক, কোনো সময় দেখা হবে আশা করি।

~ www.amarboi.com ~

আপনি ভালো থাকবেন, ও আমার শুভেচ্ছা নেবেন। যাত্রা শুভ হোক, নিরাপদে ফিরে আসবেন।
দীপেশদা

(শাহবাগ নিয়ে আমার বইয়ে মজলুম নেতা ভাসানী বিষয়ে লিখেছিলাম, সেই সুত্র ধরে দীপেশ দা 'মজলুম' কথাটার অর্থ জানতে চেয়েছিলেন। আমি ভিন্ন একটি ই-মেইলে এ বিষয়ে উত্তর দিয়েছি।)

২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫

দীপেশ দা,
মজার একটা কোইন্সিডেন্স হলো বলা যায়। আজ সারা সকাল কথা হলো আপনার কাজ নিয়েই। এখানে আমাদের 'এন্ড অফ লাইফ স্টাডি গ্রুপে' মাসে একটা কিউরেটেড মিটিং হয়। এ-মাসে আমি মিটিংটা কিউরেট করলাম এবং আমার প্রস্তাব ছিলো এ-মিটিং-এ প্রভিন্সিয়ালাইজিং ইউরোপ আলাপ হবে এবং এর সঙ্গে আমাদের রিসার্চের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে কথা হবে। সবাই আপনার বইয়ের ইন্ট্রোডাকশনটা পড়ে এসেছিলো এবং আমি মুল আলোচনাটা করলাম, পরে এ-নিয়ে আলাপ তর্ক হলো। আমি নিজেই আপনার লেখা আধাআধি বুঝেছি তারপরও সাহস করে বলে ফেললাম এবং অন্যদের একরকম পড়তে বাধ্য করলাম। অনেকের কাছেই এই তর্ক নতুন কিন্তু তারা খুবই এক্সাইটেড। যাহোক, ফিরে এসে কম্পিউটার খুলে দেখি আপনার ই-মেইল। 'দৈব' কথাটা জীবন্তই বলতে হবে।
ঈদের দিনে বসে পোষ্ট-কলোনিয়াল করছি! আমার জন্য দোজখে স্থান ইতিমধ্যেই বরাদ্দ করা আছে জানি।
আপনি ব্যস্ত আছেন জানি, তাই আর লিখিনি। ব্যস্ততা নতুন বইটা লেখা নিয়ে ধারণা করছি। আপনি কি আমেরিকায় এখন?
আমারও নানা ব্যস্ততা চলছে। নিউক্যাসেল ছেড়ে কার্লাইল নামের এক শহরে নতুন বাড়িতে উঠলাম। আমার বড় ছেলেটা গত সপ্তাহে ইউনিভার্সিটি শুরু করলো। ও কেন্ট ইউনিভার্সিটিতে ইকোনমিক্স পড়তে গেলো। এসব নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। ছেলেটা এ-দেশের হিসাবে তথাকথিত প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে বাড়ি ছাড়লো। কাহলিল জিব্রান মনে পড়ছিলো—
তোমার সন্তানেরা তোমার সন্তান নয়।
জীবনের নিজের প্রতি নিজের যে তৃষ্ণা, তারা হলো তারই পুত্রকন্যা।
তারা তোমাদের মাধ্যমে আসে, তোমাদের থেকে নয়।
এবং যদিও তারা থাকে তোমাদের সঙ্গে, কিন্তু তাদের মালিক তোমরা নও। ...
তোমরা হচ্ছ ধনুক, আর তোমাদের সন্তানেরা হচ্ছে ছুটে যাওয়া তীর।

~ www.amarboi.com ~

আপনাকে অবশ্য জিজ্ঞাসা করবো ভাবছিলাম যে, কবে কেম্ব্রিজ আসবেন? দেখা করবার চেষ্টা করবো।
শুভেচ্ছা,
জামান

২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫

জামান,
ভালো লাগলো আপনার মেল পেয়ে। আপনাদের ভাবনা-চিন্তায় যে আমার বই সহায়ক কিছু একটা হয়, এইটাই আমার প্রাপ্তি।
আপনার পুত্রের প্রাপ্তবয়স্ক হবার গল্পে আমার এক বন্ধুর বাবার কথা মনে পড়ল। কমিউনিস্ট মানুষ ছিলেন। সংস্কৃত "প্রাপ্তেষুষোড়শ বর্ষে পুত্র মিত্রবদাচরেত" কথাটাকে ভাঙিয়ে ঠাট্টা করে বলতেন, "পুত্রের ষোলো বছর বয়স হলে তার সঙ্গে মিত্রের মতো বদ আচরণ করিবে"—এইটাই নাকি মুনি-ঋষিদের শিক্ষা! আর জিব্রানের কথাগুলি চমৎকার। আমার একটা অন্য কবিতার লাইন মনে পড়ল বয়স হওয়া নিয়ে: "আমার শরীর দিয়ে তুমি তোমার যতো তৃষ্ণা/ মিটিয়ে বলো, ঢের হয়েছে, আর আমাকে দিস না!/ এবার তুমি অন্য কারুর অন্য শরীর নেবে।"
১৯শে নভেম্বর ক্রেম্ব্রিজে আমার বই নিয়ে আলোচনা, বিকাল পাঁচটা নাগাদ। বিশদ জানলে আপনাকে জানাবো।
ভালো থাকবেন।
দীপেশ দা

২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫

দীপেশ দা,
সংস্কৃত বাণী আর কবিতার জন্য ধন্যবাদ। চমৎকার।
ক্রেমব্রিজের প্রোগ্রাম চূড়ান্ত হলে জানাবেন।
আরেকটা ছোট প্রশ্ন। সাবঅলটার্ন চিন্তা বা আপনার বইটার ব্যাপারে আফ্রিকা বা ল্যাটিন আমেরিকার পোষ্ট-কলোনিয়াল ভাবুকদের আগ্রহ কেমন, এ-নিয়ে তাদের কোনো প্রতিক্রিয়া আছে?
শুভেচ্ছা,
জামান

২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫

আমার বই
জামান,
হাঁ, এই রকম আলোচনা তো অনেক হয়েছে। মিত্র ও বৈরী, দুই-ভাবেই। একটা বই দেখতে পারেন, Latin American Subaltern Studies। তা ছাড়া Jose

~ www.amarboi.com ~

Rabasa, Walter Mignolo—এঁদের কাজগুলিও দেখতে পারেন। আশা করি লাইব্রেরিতে পাবেন।
কেমব্রিজের সংবাদ জানাবো।
দীপেশ দা

১৭ অক্টোবর ২০১৫

দীপেশ দা,
আপনার ব্যস্ত সময় নষ্ট হবে ভেবে লেখা থেকে বিরত থাকি। তারপরও আপনাকে নিয়ে কথা বার্তা কিছু হলে সেটা শেয়ার করবার লোভ হয়। দুদিন আগে ডাবলিনে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের স্পন্সরে পেলিয়াটিভ কেয়ারের গ্লোবাল কনফারেন্স হলো। এই লাইনের জগত বিখ্যাত সব রাজারা হাজির ছিলেন সেখানে। আমার ডিপার্টমেন্টর প্রফেসর তেমন এক রাজা, তিনি না গিয়ে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তো আমি একধরনের রাজার দুত হিসেবে বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলাম। তবে দুতও খানিকটা সেয়ানা হয়ে ওঠে সুযোগ পেলে। আমি আমার মতো বক্তৃতাটা সাজিয়ে ছিলাম। গত সপ্তাহে দি ইকনোমিষ্ট পত্রিকা কোয়ালিটি অব ডেথ এর একটা বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং করেছে, যাতে ব্রিটেন টপ আর বাংলাদেশ যথারীতি বটমে। কিন্ত এইসব র‍্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার বিস্তর ফাঁক-ফোঁকর আছে। আর কোয়ালিটি অব ডেথ মাপার এই ধারণাটাও গোলমেলে। আমি এই পুরো র‍্যাঙ্কিং ব্যাপারটা নিয়ে বিরক্ত ছিলাম। তারা ইউরোপের বেষ্ট প্রাকটিসকে পৃথিবীর নানা দেশে ট্রান্সফারের কথা বলে। তো এই ব্যাপারগুলোকে ক্রিকিট করেই বক্তৃতা করেছিলাম। এটা বলছি কারণ, ঐ বক্তৃতাটা আমি দাঁড় করিয়েছিলাম আপনার নট ইয়েট, ওয়েটিং রুম, ট্রান্সফার, ট্রান্সস্লেশন ধারণাগুলোর উপর ভিত্তি করে। ওয়ার্ল্ড হেলথের কোনো অনুষ্ঠানে আপনার নাম নেয়া হয়েছে কিনা জানি না, কিন্তু আমি এখন সময় সুযোগ পেলে জায়গায় বেজায়গায় আপনার এই কনসেপ্টটার ডুগডুগি বাজাই। কিন্তু বলার কথা এই যে, আমার এই বক্তৃতাবাজি যাকে বলে রাজারাজরাদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনার তৈরি করে। বিশ্বস্বাস্থ্য খাতে এই কনসেপ্টটা অনেকের কাছে নতুন লাগে। বিস্তর আগ্রহ, প্রশ্ন, কৌতুহল তৈরি হয়। ঐ রাজ্যে এটা নতুন কথা বুঝতে পারি। অভিজ্ঞতাটা মজার, ভাবলাম—আপনাকে জানাই।
আপনার কাজ এগোচ্ছে আশা করি। কেমব্রিজ প্রোগ্রাম ঠিক হলে জানিয়েন।
শুভেচ্ছা
জামান
(সে বছরেই কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যলয়ের সেই অনুষ্ঠানে দীপেশ দার সাথে প্রথম দেখা হয়)

~ www.amarboi.com ~

১৭ অক্টোবর ২০১৫

জামান,

আপনি যে কোনো সময়ে লিখলেই ভালো লাগে, এর মধ্যে তো সময় নষ্টের প্রশ্নই ওঠে না। ব্যস্ততা থাকলে ছোট জবাব দিলেই হয়। কিন্তু আপনার চিঠি পেতে সব সময়েই ভালো লাগে।

আপনাদের কাজের মধ্যে যে আমার কাজ এসে পড়ে, বা আপনি নিয়ে আসেন, সেটা আমার সৌভাগ্য। কোনো কারণে, ভারতীয়দের কাছে হাজার গালাগালি পাওয়া সত্ত্বেও, প্রভিন্সিয়ালায়জিং অনেকেরই কাছেই গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। লাইডেন-এ এসেছি, কিছু বক্তৃতা দিতে ও আলোচনা করতে। কত মানুষ যে বইটি পড়েছেন বা বই-এর কথা জানেন, এসে কপি সই করিয়ে নিয়ে যান, এগুলো একদিকে ফকিরের কেরামতি বাড়ায়, আবার একে "এ বড় আজব কুদরতি" বলে ঈশ্বরের বা ভাগ্যের আশীর্বাদ বলে গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নাই।

কেমব্রিজের আলোচনা ১৯শে নভেম্বর বিকেলে, আমার ধারণা পাঁচটার দিকে। তাঁরা আমাকে জানাননি এখনো। কিন্তু যতদূর জানি তাঁদের ওয়েব সাইটে প্রচার হয়েছে, আমি খুঁজে পেলে আপনাকে পাঠিয়ে দেব।

আপনার চিঠি পড়ে মনে হলো ভালো আছেন। যেন তাই থাকেন।

সামনে পুজো, এই সময় অনেক ছোটবেলার কথা মনে পড়ে।

আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিবেন,

দীপেশদা

২২ অক্টোবর ২০১৫

দীপেশ দা,

ধন্যবাদ কেমব্রিজের প্রোগ্রামটা জানানোর জন্য। দেখা করবো আশা করছি।

লেইডেন বলতে হল্যান্ডের ইউনিভার্সিটিটা নিশ্চয়ই। ওখানে আমার অনেক স্মৃতি আছে। আমি তো আমস্টার্ডামে পিএইচ.ডি করেছি ফলে লাইডেলে গেছি অনেকবার। আমষ্টার্ডাম নিয়ে আমার একটা বই আছে ' আমষ্টার্ডাম ডায়রী' নামে। নানারকম স্মৃতি আছে ঐ শহরটাকে ঘিরে।

গত সপ্তাহ বার্মিংহাম লিটেরারী ফ্যাস্টিভেলে গিয়েছিলাম। ব্রিটেন প্রবাসী কিন্তু নিজের ভাষার সক্রিয় লেখক এমন কয়জনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল তারা। পোলিশ, সোমালী, হিন্দি ভাষার তিন লেখককেসহ আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো। আমার গল্প পড়বার সুযোগ হলো ব্রিটেনবাসীদের সামনে। এমনিতে গ্লোবাল হেলথের নানা সেমিনারে যাই। এটা ছিলো ভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা।

আপনার প্রভিশিয়ালাইজিং নিয়ে নিজ দেশে যতই গালাগালি হোক, আমার মনে হয়, দিনে দিনে এর মর্ম লোকে আরো বুঝবে। এদিকে তো আপনার ভাবনার

~ www.amarboi.com ~

জয়জয়কার শুরু হয়েছে বহু আগে থেকেই। সেটাকে আপনি কুদরতি আর কেরামতি যাই বলেন।

আমি তো আপনার ওয়েটিং রুম ধারণার কথা বিভিন্ন জায়গায় বলে বেড়াই। তবে সব যে আমার কাছেই খোলাসা হয়েছে তা তো না। এমনিতে আপনাকে দু-একটা কথা জিজ্ঞসা করবো ভাবছিলাম। জিজ্ঞাসা করছি, কিন্ত এখনই উত্তর দেয়ার দরকার নাই। কখনো অবসর হলে দিয়েন। সাবঅলটার্ন নিয়ে কথাতে কেউ কেউ প্রশ্ন তোলেন, এতে কি নিম্নবর্গের চেতনাকে কিম্বা আরো বড় অর্থে নন-ওয়েষ্টার্ন লাইফকে সেলিব্রেট করার ব্যাপার আছে কিনা। পার্থ চট্টোপাধ্যায় নিম্নবর্গের ইতিহাস বাংলা বইটাতে এর উত্তরে বলেছেন সাবঅলটার্ন তাত্বিকরা এমন কোন প্রস্তাব রাখেনি। তারা শুধু প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস-চর্চার সমালোচনা করেছে। কিন্তু এতে প্রশ্নটা একটু এড়িয়ে যাওয়া হয় যেন। আপনি আপনার লেখায় বলেছেন, যে কোনো ধারণার একটা তাত্বিক আরেকটা দৃশ্যগত দিক থাকে। ভাবছিলাম অলটারনেটিভ মডার্নিটি ধারণার ভিজুয়াল ডাইমেনশনটা কিরকম হবে?

যাহোক, দেখা হলে এসব নিয়ে আড্ডা দেয়া যেতো। আপনি কি ইউএস ফিরেছেন?

পূজার শুভেচ্ছা রইল।

জামান

২৩ অক্টোবর ২০১৫

জামান,

শুভ বিজয়া! আশা করি মা দুগ্‌গা আমাদের উপমহাদেশের সব আসুরিক শক্তির বিনাশ করবেন (যদিও এই আশাকে সত্যই কুহকিনী মনে হয়)

আপনার প্রশ্নের উত্তর দিই। আমার মনে হয়—সাবল্টার্ন স্টাডিজ-এ অন্তত আদর্শগত বা সচেতনভাবে কৃষক সমাজের সবকিছু রোমান্টিকভাবে দেখার ইচ্ছা ছিলো না। পার্থ'র ওই কথাটা ঠিক; তবে আপনার সমালোচনাও ঠিক। অবশ্যই গ্রামীণ সমাজের অনেক নিষ্ঠুরতা থাকে যা আধুনিক বিচারে কাম্য বা নৈতিক নয়। কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে, ওই সমাজের বিন্যাসে বা মানুষের ব্যবহারে আমরা মানুষী সম্পর্কের এমন কোনো সূত্র পেতে পারি কি-না যার আধুনিক সমাজের মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতেও একটা তাৎপর্য থাকে। একটা খুব সাধারণ উদাহরণ দিই: আমরা জানি যে, আমাদের যৌথ পরিবার-প্রথায় অনেক নির্যাতন থাকে বা মানুষের নানান স্বাধীনতা হ্রাস পায়। কিন্তু সেই সব পরিবারের সম্পর্কের মধ্যে এমন কিছুও থাকে যাতে পাশ্চাত্যের জীবনযাত্রার—বিশেষত যাত্রার শেষে এসে—যে ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা মানুষকে গ্রহণ করতে হয়, সেই নিঃসঙ্গতার সম্ভাবনা

~ www.amarboi.com ~

কম থাকে (বুড়ো মানুষের ওপর অনেক অত্যাচারও হয়, তা অস্বীকার করি না)। ঠিক যেমন আজকে মানুষের ভোগবাদী সমাজের পরিবর্তন দেখে অনেকেই বলতে শুরু করেছেন যে "আদিবাসী" সমাজ থেকে আমাদের অনেক জীবনযাত্রার সূত্র শেখার আছে। এই কথাটা বললে আমার মনে হয় না এই উল্টা-সত্য অস্বীকার করা হয় যে, অনেক আদিবাসী মানুষ এখন ভোগের সন্ধানে বা আদিবাসী সমাজে সমলোচনাযোগ্য অনেক-কিছুও থাকতে পারে! অর্থাৎ, পদ্ধতিগতভাবে বললে, আমরা এ কথা বলতে পারি যে, আমরা "অন্য" সমাজের দিকে তাকাই নিজেদের পরিপ্রেক্ষিতে যাকে সচরাচর স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিই, তাকে চ্যালেঞ্জ করতে ও মানুষী জীবনের অন্য সম্ভাবনা তুলে ধরতে। আমাদের দেশে কতগুলি সেন্টিমেন্ট আছে, যেগুলি খুব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মানুষের কাছে একেবারেই ভালো লাগবে না। যেমন ধরুন, আমরা যাকে ভক্তি বলি। অনেকের চোখেই তা দাস্যতার মতো মনে হয়, এবং অনেক সময়েই আমার নিজেরই তা খুব খারাপ লাগে, নেহাৎ চাটুকারিতা মনে হয়। কিন্তু বৈষ্ণবরা যখন স্বেচ্ছাকৃত দাস্য-ভাবের কথা বলেন? মীরার ভজনে যখন গাওয়া হয়, "ম্যয়নে নোকর রাখো জী"? বলাই বাহুল্য, কথাটা কোনো মানুষকে নয়, কৃষ্ণরূপী ভগবানকে বলছেন, তখন? তখন আমি বুঝি যে, কোনো কোনো মানুষ দাসত্বের মধ্য থেকেই আত্মনিবেদনের একটি ethical horizon নির্মাণ করেছেন, যার সঙ্গে দাসত্বের অবমাননার কোনো সম্পর্কই নেই। ভক্তির এই ট্রাডিশন না-থাকলে কি রবীন্দ্রনাথ গাইতে পারতেন "তোমার চরণ ধূলায় ধূলায় ধূসর হব"? আমার একটা আলোচনা আছে, ছোটই—তাতে বলার চেষ্টা করেছিলাম কীভাবে "ভিক্ষুক"-এর রূপ থেকে বৌদ্ধরা তাঁদের "ভিক্ষু" রূপটি কল্পনা করেছিলেন—যিনি অবস্থার চাপে বাধ্য হয়ে ভিক্ষা করেন, তাঁর অন্তর-বাহির কোথাও কোনো স্বাধীনতা নেই। কিন্তু যিনি স্বেচ্ছায় সব ছেড়ে ফকিরের বেশ ধরেছেন, যে সাধু চিমটে দিয়ে নিজের মনের ময়লাও সব ঝেড়ে ফেলেছেন—এমন মানুষের কথা তো আমরা কল্পনা করি, তাঁদের ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি, এঁরা কি আমাদের আধুনিকতার অংশ নন? এখন কেউ বলতেই পারেন "কতোটা স্বেচ্ছায় কীভাবে বুঝব?" আমি বলব, "বোঝা যায় না, মনে অনেক সময় সন্দেহ থাকে, সন্দেহের নিরসন হলে তবেই ভক্তি আসে, নচেত নয়।" আসলে তো স্বেচ্ছা/অনিচ্ছা একটা সাদা-কালো লাইন না, বরং একটা স্পেকট্রামের মতো।

কিছুটা কি বোঝাতে পারলাম আমার চিন্তা?

ভালো থাকবেন। কেমব্রিজে দেখা হলে খুব ভালো লাগবে। তবে আপনি অবশ্যই আপনার সুবিধা-অসুবিধা দেখে সিদ্ধান্ত নিবেন।

প্রীত্যন্তে,

দীপেশ দা

~ www.amarboi.com ~

২৪ অক্টোবর ২০১৫

দীপেশ দা,

আমার প্রশ্নের উত্তর শুধু পেয়েছি বললে ঠিক হবে না, বরং যাকে বলা যায় 'মরমে গিয়া পশিয়াছে' এবং খুবই আনন্দিত হয়েছি কারণ, আমার নিজের ভেতর ঠিক এধরনের একটা উত্তরই তৈরি হয়েছিলো। কিন্তু ইতিহাসচর্চা থেকে যদি ভবিষ্যতের একটা দিশা পেতে চাই তাহলে এই প্রশ্নগুলোর মুখোমুখি না হয়ে তো উপায় নাই। আমার এইটুকু মনে হয় যে, ইউরোপকে সমালোচনা করা মানে আমাদের দারিদ্র আর বিশৃংখলাকে হাত তালি দেয়া না। বরং আপনি যা বললেন—অন্য একটা সমাজ বিন্যাসে আমাদের সমাজ থেকে কিছু সূত্র পাওয়া যায় কিনা তা খুঁজে দেখা যা আধুনিক সমাজের মুল্যবোধের প্রেক্ষিতেও তাৎপর্যপূর্ণ। মন বলে যে তেমন অনেক কিছুই আছে। ঐ যে আপনি ভক্তির কথা বললেন সেটাকে তো এসব দেশে ঝেটিয়ে বিদায় করা হয়েছে। কিন্তু মীরার মতো-লালন যখন বলেন 'গুরু আমারে কি রাখবে তোমার চরনদাসী' কিম্বা রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন 'সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে', তখন তো মন ভেজে। এই সাবমিশনের ভেতর কোনো অপমান দেখি না। আপনি বৃদ্ধ বয়সের উদাহরণ দিয়েছেন। আপনাকে বলেছি যে, এখন 'এন্ড অফ লাইফ' বিষয়ক কাজ করছি। আমি আমার বক্তৃতায় এই তর্কটাই তুলেছিলাম যে আধুনিক ইন্সটিউশনাল মৃত্যুকে আদর্শ ধরে যে পথে চিকিৎসাবিজ্ঞান চলছে সেটাকেই আগামী পৃথিবীর মৃত্যু মোকাবেলার শ্রেষ্ঠ পথ ভাবার কোনো কারণ দেখি না। সেখানে আমাদের মতো সমাজে ভাঙ্গাচোরাভাবেও যে যৌথতার ব্যাপারগুলো অবশিষ্ট আছে সেটার সাথে মিলিয়ে মৃত্যুকে সর্বাংশে ম্যাডিকালাইজড, স্পেশিয়ালাইজড না করে ব্যাপারটাকে 'এভরিওয়ানস বিজনেসে' পরিনত করার সম্ভাবনা আছে। বৃদ্ধ বয়সে তারা কারো উপর ডিপেন্ডেন্ট হতে চায় না। এই যে এরা এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেলফের নিশান ওড়ায় সেটা কতটা তাদের চয়েস কতটা তারা বাধ্য সেটা ভাবার ব্যাপার আছে মনে হয়। ডিপেন্ডেবল কাউকে না পাওয়া গেলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হওয়া ছাড়া বুদ্ধি কি? কি ধরনের পৃথিবী আগামীতে চাই সে ভাবনা ভাবতে গেলে পূর্ব পশ্চিমের এই অভিজ্ঞতাগুলোর একটা সংশ্লেষের দরকার মনে হয়। একদিন লন্ডন থেকে নিউক্যাসেল আসছিলাম রাতের বাসে। আমার পাশে বসেছিলেন এক সিলেটী ভদ্রলোক, রেষ্টুরেন্টে সবজি কাটাকাটির কাজ করেন, বাংলাদেশের গ্রাম থেকে এসেছেন, স্কুল পাশ করেননি। রাতভর কথা হলো। কথায় কথায় আমাকে বলছিলেন—'বুঝলেননি ভাই, এরার দ্যাশে বিচার আছে আচার নাই আর আমরার দ্যাশে আচার আছে বিচার নাই।' ডিলেমাটাকে চমৎকার ধরেছেন তিনি। আমাদের দেশের আচার বলতে হয়তো তিনি ঐ 'মানুষী সম্পর্ক'টাকে বুঝিয়েছেন যা তিনি এখানে মিস

~ www.amarboi.com ~

করছেন। ঐ আচার আর বিচারের একটা সঠিক মেলবন্ধনটাই বোধহয় আগামী পৃথিবীর দাবী।

এই আচারের একটা গোলমেলে ব্যাপার ধর্ম। গোলমেলে বলছি বিজ্ঞান, রাজনীতি ইত্যাদির আতস কাঁচ দিয়ে যখন দেখছি। ঐখানে খটকা একটা আমার রয়েই গেছে। যখন দেখুন, মা দুর্গা সব দুর্গতি নাশ করবেন তখন কথাটাকে মজা হিসেবে নিই, কিন্তু বহু মানুষের কাছে কথাটা তো মজার না, সত্যিকারের বিশ্বাসের। যাহোক, আপনাকে বলেছিলাম জীবনানন্দকে নিয়ে ডকু-ফিকশন ধরনের একটা লেখা লিখছি। তিনি তো বড় এলেমদার লোক। যেসব কথা বলছি তার প্রাসঙ্গিক কিছু কথা তার লেখা থেকে তুলে দেবার লোভ সামলাতে পারছি না। এসব তিনি লিখেছেন সেই গত শতাব্দীর চল্লিশ দশকে। জীবনানন্দের 'বাসমতি উপাখ্যান' উপন্যাসের এক চরিত্র বলছে:

'আজকাল ধর্মের প্রয়োজন বোধ করে না কেউ। কেন করবে? এটা ত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের জায়গা। এখানে টাকা, স্ত্রীলোক বা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের এলাহী খোরাক কোথায়? তাছাড়া সভ্যতার মানেই বা কী? সভ্যতা মানেই সুখীদের ইকনমিক্স আর অসুখীদের পলিটিক্স। তিনটে বিস্তার নিয়ে কাজ; ধর্ম চতুর্থ বিস্তারের জিনিস, সভ্যতার এলাকায় পড়ে না। সুখীদের ভেতর অনেক তাজা-তাজা কইয়ে বলিয়ে আছে-গত চার-পাঁচ শ বছর ধরে তারা ত হু হু করে মহাপুরুষ হয়ে যাচ্ছে। পাঁচ ইন্দ্রিয় ছাড়া-মাইক্রোফোনের জন্যেও তাদের লোভ আজকাল ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে দেখছি। এ পথ ধরে কি তারা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের দিকে পৌছতে পারবে-ধর্মের দিকে? আশা করেছিলুম পারবে হয়ত। কিন্তু এখন দেখছি সব গাবিয়ে যাচ্ছে, মাইকের বক্তা মহাপুরুষদের কেবলই দাবিকর্দম ত নজরে পড়ছে।'

সে চরিত্র আরেক জায়গায় বলছে :

'এটা আবেগের দেশ-এখানে ধর্মই টিকবে, কিন্তু ধর্মকে বেশি বিশুদ্ধ করতে গেলে সেটা টিকবে না। টিকলে কত ভাল হত-কিন্তু হবার নয় বলেই মনে হচ্ছে। এদেশের কর্মপ্রেরণাও টিকবে, কিন্তু কর্ম টিকবে না। না টিকেই ভাল হবে হয়ত, বেশি ধর্মাবেগ নিয়ে আমরাও যেমন পিছিয়ে রইলাম, বেশি কাজ করে ইউরোপও ত এগতে পারল না-আমদের চেয়ে পিছিয়ে থাকার সামিল ত।'

আবার তার আরেক উপন্যাস 'সুতীর্থর' এক চরিত্র বলছে:

'মানুষ মানে যারা মারণমন্ত্র, শেল তৈরি করতে পারে? তার চেয়ে যারা তালপাতার ব্যাগ তৈরি করতে পারে তারা বেশি মানুষ। যারা একশোবার করে ইউরোপ আমেরিকায় এশিয়ায় কনফারেন্স পাতায় আর ভাঙে, পরস্পরকে বজ্জাৎ বলে গালাগাল দেয়-একেবারে উৎখাত করে ফেলবার ফিকিরে থাকে, তারাই তো মানুষ এখনকার পৃথিবীতে আর তাদের তাঁবেদাররা-ব্যাঙ্কে অফিসে-

~ www.amarboi.com ~

ডিপার্টমেন্টাল চেয়ারে বসে পৃথিবীর সর্বত্র। এর চেয়ে বেশি মানুষ মনে করি আমি যারা নদীর পারে, হোগলার ক্ষেতের পাশে বসে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে কি করে বাবুই পাখিগুলো বাসা তৈরি করে, তেমনি শান্তিতে তেমনি নীড় মানুষের জন্যেও তৈরি করবার প্রেরণা পায় তারা, কিন্তু তারপরেই উপলব্ধি করে মানুষ তো মারীবীজ হাঁকিয়ে চলেছে পৃথিবীতে-বাবুইদের সঙ্গে মানুষের তো কোনো মিল নেই-কি করে স্থিরতা পাবে মানুষ পৃথিবীতে-কি করে শান্তি পাবে?'
চিটাগাং পড়বার সময় যে হোস্টেলে থাকতাম সেখানে এক ভিক্ষুক আসতো। প্রায় এসে বলতো, 'শান্তি নাইরে পাগলা শান্তি নাই, দে দুইটা টাকা দে।'
আপাতত রাখি। আপনার ভিক্ষু নিয়ে লেখাটা পাঠালে খুব খুশি হব।
শুভেচ্ছা,
জামান

২৬ অক্টোবর ২০১৫

জামান,
ব্যস্ততার কারণে জবাব লেখা হয় নাই, কিন্তু আপনার বক্তব্যের সঙ্গে আমার মনের ও মতের মিল গভীর। পরে আবার লিখবো। ভালো থাকবেন, দীপেশদা

১৭ জানুয়ারি ২০১৬

দীপেশ দা,
ঢাকা থেকে ঘুরে এলাম, এর আগে গিয়েছিলাম কেরালা আর কলকাতা। বেশ লম্বা সফর। নানা ব্যস্ততায় কেটেছে। এন্ড অফ লাইফ নিয়ে কেরালার একটা প্রজেক্টের কথা বলেছিলাম আপনাকে সেটা দেখতে গেলাম। নানা ইন্টারেষ্টিং ভাবনার খোরাক হলো। অনেকদিন পর কলকাতা গেলাম। ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট, কোলকাতার গেষ্ট হাউজে ছিলাম। আপনার কথা মনে পড়ছিলো। ঐ চত্বরে তো আপনি ঘুরে বেরিয়েছেন এক সময়। এখন অবশ্য নানা ঝলমলে বিল্ডিং হয়েছে। জীবনানন্দ যে বাড়িটায় থাকতেন সেটা দেখতে গেলাম, জীবনানন্দ নিয়ে কাজ করছেন অনেকদিন ভুমেন্দ্র গুহ, তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম কিন্তু তার আগের দিন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তিনি, সেখানে দেখতে গেলাম তাকে, আর দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমি কলকাতা থাকতেই মারা গেলেন তিনি। তার সঙ্গে অনেক আলাপ করবার ছিলো, হলো না। কলকাতার বইপাড়া, কফি হাউজ ঘুরলাম। তেমন কিছু পাল্টায়নি। ওখানে ঘুরতে ঘুরতে ভাবছিলাম এই শহরের ভবিষ্যত এসপিরিশন কি হওয়া উচিৎ? এই যে অগোছালো একটা পরিবেশ, মানুষের ভেতর সেট-ব্যাক একটা ভাব, এইটা পাল্টে কলকাতার কি

~ www.amarboi.com ~

প্যারিস হয়ে উঠার আকাংখা করা উচিৎ নাকি বিকল্প কোনো আধুনিক শহরের নমুনা হিসেবে এই জীবনের কিছু উপাদান অটুট রেখে দেয়া দরকার? তাই যদি হয় সেগুলো কি? জানলাম, আপনি ঢাকা যাচ্ছেন, কবে যাবেন? আপনার কাজ এগিয়ে যাচ্ছে নিশ্চয়ই।
ভালো থাকবেন।
জামান

১৮ জানুয়ারি ২০১৬

জামান,
আপনার সফর ভালো হয়েছে শুনে খুশি হলাম। জোকায় এক বছর পড়িয়েও ছিলাম, আর কয়েক বছর আগে গিয়ে ক্যাম্পাসের ঝলমলে ভাব দেখেছি। ভূমেন্দ্রবাবুর মৃত্যুটা দুঃখের।
শহরটার এসপিরেশন কী হওয়া উচিত? খুবই ভালো প্রশ্ন, কিন্তু কেউ কি শহরটাকে নিয়ে ভাবে আর? সবই তো এড-হক-ভাবে চলে। ঢাকুরিয়ায় একটা বড় লেক আছে, রবীন্দ্র সরোবর। ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট বুদ্ধি করে তার সমস্ত পাড় বাঁধানোর পরিকল্পনা নিয়েছেন। কাজ অনেকটা এগিয়েছে, ফলে লেকের জলে অক্সিজেন কমে মাছ ইত্যাদি মরতে শুরু করেছে। হা আমাদের পরিকল্পনা! কন্ট্র্যাকটর, অফিসার পয়সা পেল, সেইটাই বড় কথা। কেমন একটা দিন-আনি-দিন-খাই-এর রাজনীতি।
ভালো থাকবেন,
দীপেশ দা

১৬ নভেম্বর ২০১৬

দীপেশ দা,
আপনাকে প্যালিয়াটিভ কেয়ার বিষয়ে আমার যে আর্টিকেলটা পাঠিয়েছিলাম সেটা Social Science and Medicine জর্নালে ছাপা হচ্ছে। অনলাইন ভার্সনের লিঙ্কটা নীচে পাঠালাম। আমার এ লেখাতেই প্যালিয়াটিভ কেয়ার এবং বৃহত্তরভাবে গ্লোবাল হেলথ আলোচনায় সম্ভবত এই প্রথম আপনার 'ওয়েটিং রুম অব হিস্টি' ধারণার প্রয়োগ হলো। এই পত্রিকা গ্লোবাল হেলথ জগতে বেশ মর্যাদাবান পত্রিকা। আনন্দেরই খবর। আপনার সাথে এনিয়ে আলোচনায় বেশ উপকার হয়েছিলো। ধন্যবাদ সেজন্য। লেখাটা অচিরেই ওপেন একসেস হবে।
ঢাকায় নানা ব্যাস্ততায় আছি। ভালো থাকবেন।
জামান

~ www.amarboi.com ~

১৬ নভেম্বর ২০১৬

জামান,
এই জার্নালটার কথা তো আমিও জানি! নামী পত্রিকা। আমার প্রয়োগ খুবই কার্যকরী, আমি তো আর কোনদিন এইরকম চিন্তা করতাম না "এন্ড অফ লাইফ কেয়ার" নিয়ে।
ভালো থাকবেন।
দীপেশ দা

১ জানুয়ারি ২০১৭

জামান,
আমাদের নতুন বছরের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানবেন।
ঢাকা ভ্রমণ বেশ ভালো হলো। বক্তৃতা, আলোচনা অনেক হলো, কিন্তু আড়াই ঘন্টা আলোচনার পরও মনে হয়, আরো সময় পেলে ভালো হতো। যে কোনো আইডিয়া সত্যিকার কমিউনিকেট করতে সময় লাগে, সেই সময়টাই ছিলো না হাতে, কারণ, ঝটিকা সফর করতে হলো। রোচনা যায় নাই, তাই আমি ঢাকা-কলকাতা-দিল্লি হয়ে ফেরৎ আসলাম দুই সপ্তাহে। কিন্তু তার খেসারৎ দিলাম এই, যে দিল্লি থেকে এক গলার ইনফেকশন নিয়ে ফিরলাম, তাতে দিন সাতেক আমি ভোগার পর তা এখন রোচনাকে ধরেছে!
তবে ঢাকার মানুষদের ভালোবাসার উত্তাপের তো কোনো তুলনা নাই!
আপনার সঙ্গে স্কাইপে কথা হলে বেশ ভালো হবে। আমি ইসরায়েল যাচ্ছি আগামী সপ্তাহে, ১২ই ফিরবো, তারপর একদিন কথা বলি?
আপনার উপন্যাস শেষ-হওয়া বাবদ অনেক অভিনন্দন রইলো। ছাপা হলে পড়বো। লেবাননের গবেষণার থেকে তো অনেক শেখার থাকবে!
আমার বই নিয়ে চিন্তা চলছে, বক্তৃতাও—কিন্তু হাতে অনেক অন্য কাজও আছে, তাই বই শ্লথগতি।
ভালো থাকবেন,
দীপেশদা

২১ মার্চ ২০১৭

দীপেশ দা,
'একজন কমলালেবু' নামে জীবনানন্দকে নিয়ে বইটা পাঠিয়েছি আপনার ঠিকানায়। পেলেন কিনা জানিয়েন। বইটা কি জীবনী না উপন্যাস না ডকু ফিকশন ইত্যাদি নিয়ে নানা কথা হয়েছে। আমি ঠিক জানি না, হয়তো এর কোনটাই না বা

~ www.amarboi.com ~

সবকিছুই। আসালে বহুদিন যাবৎ আমার মাথায় জীবনানন্দের ভুত আছর করে করে ছিলো। ভেবে দেখলাম এই ভুত নামানোর একটা উপায় হচ্ছে এই ভুতের সঙ্গেই মোকাবেলা করা। তার জীবনটাকেই বোঝার চেষ্টা করা। বইটা আমার নিজের মতো জীবনানন্দকে বোঝার সেই জার্নিটা নিয়েই। এর ক্যাটাগরী নিয়ে ভাবিনি।

আপনি কি শিকাগো ফিরেছেন?

জামান

২১ মার্চ ২০১৭

জামান,

অবশ্যই, পেলেই জানাবো। বইটি নিয়ে আমারও খুব কৌতূহল আছে—কী করেছেন দেখার জন্য। জীবনানন্দ ভূতের মতোই—মন কেবল তাঁর সঙ্গে কেবলই "জলের মতো ঘুরে ঘুরে এক কথা" বলতে চায়। আপনাকে আবারও অভিনন্দন। ব্যস্ত, সাংসারিক জীবনেও কত কী করে ওঠেন জামান, চাট্টিখানি কথা নয়।

আমি আবার পরশু বস্টন যাবো, রবিবার ফেরা। কাল রোচনা ফিরবে কলকাতা থেকে।

আপনি অনেক ভালো থাকবেন,

দীপেশদা

১ এপ্রিল ২০১৭

জামান,

আপনার বই এলো। আমি একটু একটু পড়ছি, আর ভাবছি এটা একটা অসাধারণ বই হয়েছে। জীবনানন্দকে নতুন করে ফিরিয়ে দিলেন আপনি। মনে হলো, যেন অনেকদিনের জমা হওয়া মলিনত্ব মুছে কোনো একটা আলোর কাছে এসে দাঁড়ালাম। রোজকার কাজের প্রাতিষ্ঠানিক জীবনে একটু একটু করে একটা গ্লানিবোধ সঞ্চিত হয়, সত্যিকারের কবিরা হঠাৎ অন্য কোথাও নিয়ে যান, এমন একটা জায়গায় যার কথা আমরা প্রাত্যহিকের আচ্ছন্নতায় ভুলে থাকি।

আপনার বই সেই বিস্মৃতির পর্দা ফেঁড়ে একটা অন্য জগতের বার্তা নিয়ে এলো। খুব দরদী, সুন্দর বই হয়েছে। আমাকে (ও আমাদের) যে এক কপি কষ্ট করে পাঠালেন, তা আমার সৌভাগ্য। আপনি আমার অনেক শুভকামনা জানবেন। আপনার লেখনী যেন অব্যাহত থাকে।

দীপেশদা

~ www.amarboi.com ~

১ এপ্রিল ২০১৭

দীপেশ দা,
বইটা পেয়েছেন এবং পড়তেও শুরু করেছেন জেনে খুব ভালো লাগলো।
আপনার মন্তব্যে আমি একাধারে আপ্লুত এবং বিব্রত।
বইটা লেখার পেছনে ঠিক ঐ ভাবনাটাই কাজ করেছে, আমাদের দিনযাপনের গ্লানি থেকে যদি একটু বেরিয়ে আসতে পারি...। শেষ পর্যন্ত কতটুকু পেরেছি জানি না।
বইটা পড়া শেষে আপনার মতো জানাবেন।
আর এর মধ্যে স্কাইপে কথা হবে।
জামান

৩ এপ্রিল ২০১৭

জামান,
বইটা পড়ে ফেললাম। এক্ষুণি আর কিছু লিখতে পারছি না। চোখের জলে লেখার ক্রীন ঝাপসা। আপনার শুভ হোক।
দীপেশ দা

(দীপেশ দা অঙ্গীকার চলচ্চিত্রে গাওয়া তার গানের ইউটিউব ভিডিও পাঠিয়েছিলেন। পরের ই-মেইলে সে গান নিয়ে কথা। এর মাঝে আমি শিকাগোতে তার বাড়িও ঘুরে এসেছি। সেই সূত্রে বলে রাখা যায় যে আমিও অনানুষ্ঠানিকভাবে শিকাগোতে তার বাড়ির গানের আসর প্রসঙ্গ—যেখানে আমিও গান করেছিলাম। আমিও অনানুষ্ঠানিকভাবে গান করে থাকি)

১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

দীপেশ দা,
দারুন লাগলো। শিকাগোতে আমাদের গানের আসরের স্মৃতি মনে পড়লো। আপনার গানের ইতিহাস যে এত পুরনো তা তো বুঝিনি! আপনার গানের কেরিয়ারও তো উজ্জ্বল হতো...
জামান

১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

গান বড়ো প্রাণের জিনিস, জামান। আপনারও তো তাই। আমার ধারণা সেই গান-ভালোবাসা মনটা আমাদের কাজে-কর্মেও আসে, তাই না?
দীপেশ দা

~ www.amarboi.com ~

১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

গানের ভেতর বঙ্কুরে বলে আপনার ঐ টান বুকে গিয়ে বেঁধে দীপেশ দা। ঐ যে 'পেরজাপতি' বললেন তাতে পুর্ববাংলার টান। গান ভালোবাসাটা যে কাজে কর্মে আসে সেটা নুতন করে ভাবছি। আমার গানের শুরু সেই ছোট বেলাতেই। ফাংশনে গাইতাম, পুরষ্কার, টুরষ্কার পেয়েছি। বাবা মা দুজনেই ছিলো গানের ভক্ত। অফিস ফাংশনে আব্বা আম্মা উঠে যুগল গাইতেন, 'মোরা আর জনমে হংস মিথুন ছিলাম'। কতদুর ফেলে এসেছি সেসব।
ভালো থাকবেন।
জামান

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

জামান,
পূর্ব বাংলার টান তো ছিলই। কিন্তু গানের মধ্যেই বাঙালির জান—সে কীর্তন হোক, বাউল হোক, ভাওইয়া-চটকা হোক, ভাটিয়ালি হোক, আধুনিক হোক, রবীন্দ্র-নজরুল হোক—গান কেমন মনে হয় রক্তের মধ্যে গিয়া ঢোকে। আমার তো আব্বাসের গান শুনলে তাই হইতো। গান আমার আব্বা-আম্মারও খুব প্রাণের জিনিস ছিলো। আমার দৃঢ় ধারণা যে, এই জানটা আমাদের কর্মক্ষেত্রেও অন্যরূপে দেখা দেয়। মানুষের ইতিহাসে যা ভিন্ন, তা হলো সেন্টিমেন্ট। আপনার "এন্ড অফ লাইফ কেয়ার" নিয়ে কাজ, আর আমার প্রোভিন্সিয়ালাইজিং একই সেন্টিমেন্ট প্রণোদিত। তাই আমাদের কাজ পরস্পরের সঙ্গে কথা কয়।
ভালো থাকবেন।
দীপেশ দা

২৫ জুলাই ২০১৮

দীপেশ দা,
তৈমুরের কাছ থেকে আপনার 'মনোরথের ঠিকানা' পেলাম। পড়বার জন্য মুখিয়ে আছি। অনেক ধন্যবাদ বইটা পাঠাবার জন্য।
শুভ কামনা রইল।
জামান
(আমি 'আমার দীপেশ আবিষ্কার' নামে বই প্রকাশ করতে যাচ্ছি জানিয়ে মেইল করতে তিনি নীচের প্রতিক্রিয়া জানান)

~ www.amarboi.com ~

৩ জানুয়ারি ২০১৯

জামান,

আপনার বইয়ের খবরে চমৎকৃত। আবিষ্কার জিনিসটাই তো পারস্পরিক—দুইজনেরই জীবন বদলে দেয়। তাই তো হয় বন্ধুত্বে, প্রেমে (বৃহৎ অর্থে), জ্ঞানে। পারস্পরিকতাবিহীন যে আবিষ্কার, যার মধ্যে কোন mutuality নাই, সে হলো জড়পদার্থের আবিষ্কার, যা করে মানুষ এখন পৃথিবীর নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছে। কাজেই আপনার এই বইয়ের খবরে আমারও আপনাকে আবিষ্কারের খবর আছে। ভালো থাকবেন। কথা হবে।

দীপেশ দা

আমার বই